মাসুদ রানা

মিশন তেল আবিব

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা। জানুয়ারী মাস।

যথারীতি দুরু দুরু বুকে বসের চেম্বারে নক করল মাসুদ রানা। জরুরি তলব, তাই শীতের মধ্যেও সামান্য ঘামছে। কাজে কী কোথাও মারাত্মক কোন ভুল করে ফেলেছে ও? না কি দেশের কোন বিপদ?

'কাম ইন!' গমগমে ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল চেম্বার থেকে।

রানার বুকের ভিতর রক্ত যেন ছলকে উঠতে চাইছে। ভিতরে ঢুকে দেখল, খোলা একটা ফাইলে তাকিয়ে আছেন বস্। কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কোঁচকানো। হাতে ধরা পাইপ থেকে নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কামরার ভিতর মধ্য ইউরোপের দামী, সুগন্ধি তামাকের মিষ্টি একটা গন্ধ। 'বসো।'

বসল রানা, এতই সাবধান যে সামান্য শব্দও হলো না।

'এটা তোমার ফাইল।' খোলা ফাইলে টোকা দিলেন বিসিআই চিফ, প্রয়োজনের চেয়ে একটু বোধহয় বেশি জোরেই। রানার দিকে এখনও মুখ তুলে তাকাননি। 'গত দু'মাসে কোথায় গেছ তুমি, কী কী করেছ, সব এখানে রিপোর্ট করা হয়েছে।'

মাথার ভিতর তুফান, রানা চিন্তা করছে–এত থাকতে বস্ হঠাৎ ওর ফাইল নিয়ে পড়লেন কেন? বোঝাই যাচ্ছে, ওকে নতুন কোন অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার জন্য ডাকা হয়নি। গত দু'মাসে ও কী করেছে না করেছে তার উপর চিরনি চালিয়ে খুঁত আর ত্রুটি বের করা হয়েছে, ডেকে এনে তাই এখন দুরমুশ করা হবে।

মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে, ধৈর্য ধরবার পরামর্শ দিয়ে সেটাকে শান্ত করতে হলো।

'প্রথম রিপোর্টটা এসেছে সউদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে,' ফাইলের দিকে আরও একটু ঝুঁকে বললেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। 'এটা একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেস। তাও অন্য কোন ব্যাঙ্ক নয়, স্বয়ং বাদশার নিজস্ব ব্যাঙ্ক। কোন ব্যাকআপ ছিল না, তুমি একাই অস্ত্রের মুখে কর্মচারীদের জিম্মি করে তিন বস্তা মার্কিন ডলার নিয়ে বেরিয়ে এসেছ।'

বসকে রানা পাগল ভাবছে না। 'বুড়োর মাথা–' পর্যন্ত ভেবেছিল, তারপর সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিয়েছে। ওর ধারণা, মারাত্মক কোনও ভুল করছেন বস্। বয়সের কারণে এখনও ধরতে পারছেন না কী ভুল। আসলে ভুলটা হচ্ছে–এটা রানার নয়, অন্য কারও ফাইল।

চুপ করে থেকে মজা পাচ্ছে রানা। দেখতে চায় নিজের ভুল ধরতে পেরে বস্ কেমন বিব্রত হয়ে পড়েন।

'ডলার ভর্তি বস্তাগুলো ট্রলিতে ছিল, ভল্ট থেকে বের করে কাউন্টারের দিকে আনা হচ্ছিল,' বলে চলেছেন রাহাত খান। 'সে সময় তোমার হাতে দুটো পিস্তল দেখা গেছে–দুটোই ওয়ালথার। চারজন গার্ডকে সরাসরি মাথায় গুলি করে মেরেছ। লুকানো ভিডিও ক্যামেরায় তোলা ছবিতে দেখা গেছে গুলি করার সময় দাঁত বের করে হাসছিলে। ট্রলিটা ব্যাঙ্ক থেকে বের করে এনে সোজা একটা মাইক্রোবাসে তুলেছ। তারপর ব্যাঙ্কের ভিতর একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়েছ। ওটা বিস্ফোরিত হওয়ায় ব্যাঙ্কের আরও তিনজন লোক মারা গেছে।'

রানার বাইরের চেহারা সুবোধ বালক। ভিতর ভিতর একটু যেন ঘাবড়ে গেছে। বসকে আর আদর করে 'শালা বুড়ো' ভাবতে পারছে না ও। মনে হচ্ছে, ভুলটা কি ওর নিজেরই? গত জন্মের

কথা হচ্ছে না তো?

'এই ঘটনার পাঁচ দিন পর তোমাকে দেখা গেছে কায়রোয়,' বললেন বস্। 'আল-মানসুর ইয়াজদানী, মিশরের শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় নেতা, জুম্মার নামাজ সেরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে তাঁকে খুন করেছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট মাসুদ রানা।'

এবার মৃদু একটা ধাক্কা খেল রানা। রিয়াদে ব্যাঙ্ক ডাকাতির বা কায়রোয় ধর্মীয় নেতা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যে ঘটেনি, তা তো নয়! মিডিয়াতে এ-সব প্রচারও হয়েছে, বলা হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় ডাকাত এবং আততায়ী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

'মুসল্লিরা তোমাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেছিল। খুব না কি মারধরও করেছে। অনেকে সেই মার খাওয়ার ফটোও তুলেছে। গণপিটুনি খাচ্ছিলে, অথচ তারপরও কীভাবে যেন পালিয়েছ তুমি এবং, অকাট্য প্রমাণ থাকায় এ-ও বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে এই ঘটনার ছ'দিন পরই ভ্যাটিকান সিটিতে দু'জন বিশপ খুন হয়েছে তোমার হাতে; যদিও মারতে চেয়েছিলে পোপকে।'

'সার,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'ফাইলটা কি সত্যিই আমার?'

'কী বলতে চাও?' বলে এই প্রথম মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন রাহাত খান। চোখ অত্যন্ত গরম।

লে বাওয়া!–ভাবল রানা।–খারাপ কী বললাম আমি?

'এরপর কুয়ালালামপুর ক্যান্টনমেন্টে গোপন একটা মিলিটারি প্রজেক্ট স্যাবটাজ করো তুমি। সেখানেও লুকানো ভিডিও ক্যামেরা তোমার ছবি তুলেছে। তবে সে-সব ছবি বা তোমার নাম মিডিয়াতে আসেনি। তার কারণও আছে।

'এরকম আরও কয়েকটা অপারেশন চালিয়েছ তুমি।' সবগুলোই আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রে। ও-সব দেশের ইন্টেলিজেন্স মাসুদ রানাকে চেনে। বিপদে-আপদে বহুবার তুমি ওদেরকে সাহায্যও করেছ অতীতে। তাই মিডিয়াকে কিছু না জানিয়ে ওরা

আমাকে রিপোর্ট করেছে।'

'কিন্তু, সার...' বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পেরে রানা এখন প্রায় দিশেহারা।

হলে কী হবে, রাহাত খান ওর কথা শুনতে পাননি, কিংবা শুনেও না শুনবার ভান করছেন। 'সর্বশেষ রিপোর্টটা এসেছে গত হপ্তায়, শুক্রবারে, প্যালেস্টাইন থেকে। ইয়াসির আরাফাতের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকারী, ডান হাতই বলা যায়, মোহাম্মদ জাকির আসলামকে খুন করেছ তুমি–তোমাকে চেনেন, এমন কয়েকজন নেতার সামনে। ব্যাপারটা ভিড়ের মধ্যে ঘটেছে, তাই দেহরক্ষীরা তোমাকে গুলি করতে পারেনি।'

'এ অসম্ভব, তাই না, সার?' হঠাৎ বিরাট একটা স্বস্তি বোধ করল রানা। 'কারণ গত শুক্রবারে আমি...'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন। আমি কি তোমার কাছে জবাবদিহি চেয়েছি? গত শুক্রবার তুমি আমার সঙ্গে, আমার বাড়িতে বসে ডিনার খাচ্ছিলে–এ তো আমি জানিই।'

'তা হলে?' নীলিমা থেকে ধরণীতে পতনটা রানার নির্ভেজাল।

ফাইল থেকে মুখ তুলে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন বিসিআই চিফ। গম্ভীর। ধীরে-সুস্থে নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরালেন। নীলচে একরাশ ধোঁয়ার ভিতর হারিয়ে গেল রাশভারী অবয়ব। 'উত্তরটা অবভিয়াস। কেউ একজন তোমার চেহারা ও পরিচয় নিয়ে এ-সব অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে।'

'উদ্দেশ্য, সার?'

'সেটাও পরিষ্কার।' পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন রাহাত খান। 'কেউ একজন আমাদের সুনাম নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। বিপদে ফেলতে চাইছে বাংলাদেশকে।'

চুপ করে থাকল রানা।

'যে বা যারাই হোক, দেশের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র তুমি ব্যর্থ

করে দিয়ে আসবে,’ বললেন বস্। ‘ইতিমধ্যে ভয়ানক দুর্নাম হয়ে গেছে তোমার। কোনও কোনও দেশ তোমার একটা ব্যবস্থা করার জন্যে তাদের সেরা এজেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা চেষ্টা করব, তাদের যেন ফিরিয়ে নেয়া হয়। এটাই তোমার দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট, রানা।’

‘দ্বিতীয়, সার?’ রানা হতচকিত। আজ কি চমক দেওয়ার নেশায় পেয়েছে বুড়োকে? ‘আমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট কোনটা?’

‘শাকিলা মেহরুনের নাম শুনেছ? ফিলিস্তিনী নৃত্য শিল্পী?’ প্রশ্ন করলেন বস্। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। ডেস্কের দেরাজ খুলে একটা ফোল্ডার বের করলেন তিনি। ‘প্লেনে উঠে এটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলে তার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাবে। মেয়েটা তিন বছর ধরে আমাদের হয়ে কাজ করছে। প্রচুর তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। এখন সময় হয়েছে ইজরায়েল থেকে তাকে বের করে আনবার। তোমার মেক্সিকান বন্ধু রিকার্ডো বারকুচি আর তার স্ত্রী কনসুয়েলা বারকুচি এখন তেল আবিবে, চাকরি করছে মেক্সিকান দূতাবাসে। যোগাযোগ করে দেখতে পারো, ওরা হয়তো ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে আসতে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে।’

‘একই সঙ্গে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট এই প্রথম পাচ্ছি,’ বলল রানা, অনেকটা জনান্তিকেই।

‘আসলে দুটো নয়, তিনটে।’ রাহাত খান গম্ভীর, কণ্ঠস্বর এত ভরাট, যেন গুড়গুড় করে উঠল কালো মেঘ।

‘জী?’ স্থির হয়ে গেল রানা।

‘শাকিলা আমাদেরকে জানিয়েছে, তেল আবিবের কাছে ইজরায়েল সরকারের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিকাল ডিপার্টমেন্টের ফ্যাসিলিটির ভিতর, নেভির একটা মেরিন রিসার্চ ল্যাবে গোপন কী একটা যেন এক্সপেরিমেন্ট করছে ইজরায়েলি বিজ্ঞানীরা। প্রজেক্টটার সিকিউরিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আর মোসাদ উভয়কে।

'দুই সংস্থার দু'জন কর্মকর্তা সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করে ওখানে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে কর্নেল অরওয়েল জারকা আর মোসাদ থেকে কর্নেল মারকুইজ হেজাজ। এদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে হলে ইলোরার কাছ থেকে ফাইল চেয়ে নিয়ে পোড়ো।

'শাকিলা মুসলমান হলেও, কর্নেল জারকার কাছেই থাকে সে। ফোল্ডারে চোখ বুলালে কারণটা জানতে পারবে। লোকটা স্যাডিস্ট, বদমেজাজী। তার মধ্যে নৈতিকতারও কোন বালাই নেই।

'প্রজেক্টের দ্বিতীয় সিকিউরিটি চিফ মোসাদের কর্নেল মারকুইজ হেজাজ। এ-ও শাকিলার প্রতি দুর্বল, বয়সের ব্যবধান বিশ-বাইশ বছর হওয়া সত্ত্বেও। লোকটা অত্যন্ত অ্যামবিশাস। প্রথমে মোসাদের চিফ, তারপর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হতে চায়। শাকিলার প্রতি যতই দুর্বল হোক, দু'জনের কেউই কিন্তু গোপন ল্যাব সম্পর্কে তাকে বিন্দুমাত্রও জানতে দেয়নি।

'যাই হোক, আমাদের নির্দেশ পেয়ে গোপন প্রজেক্ট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা চালাচ্ছিল শাকিলা, এমনি সময় তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'

'কীভাবে, সার?'

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। যাই হোক, এটাই তোমার তৃতীয় টার্গেট বা গোল, অ্যাসাইনমেন্টও বলতে পারো—গোপন প্রজেক্টটা সম্পর্কে জানা; জানার পর যদি মনে হয় ওটা ক্ষতিকর কিছু, তা হলে সম্ভব হলে ধ্বংস করে দিয়ে আসা।'

'একের ভিতর তিন,' রানার শুধু ঠোঁটই নড়ল, কোন আওয়াজ বেরোয়নি।

'খুঁজলে একের ভিতর বহু দেখতে পাবে,' ভারী গলায় বললেন বিসিআই চিফ, ঠোঁটের নড়াচড়া দেখেই ধরে ফেলেছেন

কী বলেছে রানা। 'শোনো, তোমাকে ইজরায়েলে ঢোকাবার একটা ব্যবস্থা আছে আমাদের হাতে।'

নড়েচড়ে বসল রানা। একটু সামনে ঝুঁকে।

'একজন রানার ছিল, তেল আবিব আর বৈরুতে আসা-যাওয়া করত। সে-ই ছিল শাকিলার কনট্যাক্ট। শাকিলার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে রানা এজেন্সির বৈরুত শাখায় ডেলিভারি দিত।

'সেই রানারকে খুন করা হয়েছে। সেজন্যেই শাকিলার কাছ থেকে সর্বশেষ রিপোর্টটা আমরা পাইনি। ওই রিপোর্ট পেলে আমরা হয়তো জানতে পারতাম, গোপনে কীসের গবেষণা চলছে মেরিন ল্যাবে।

'রানারের আততায়ীকে মেরে ফেলা হয়েছে গত পরশু। এ সেই তোমার নকল লোকটা, রানা। আমাদের এজেন্টরাই তাকে মেরেছে। কিন্তু সে যে মারা গেছে তা এখনও জানে না ইজরায়েল। মারার পর আমাদের এজেন্টরা তার কাগজ-পত্র সংগ্রহ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে আসলে সে ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট।'

'লোকটার নাম কী, সার?' রানার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

'মাসুদ রানা,' বললেন রাহাত খান। 'তার কাছ থেকে দুটো আইডি কার্ড পাওয়া গেছে। প্রথম কার্ডটা কাগজ নয়, ইস্পাতের একটা চাকতি, তার উপর বিভিন্ন তথ্য প্রিন্ট করা হয়েছে। চাকতির এক পিঠে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন আছে, যার কোনও অর্থ বের করা যায়নি। আর উল্টো পিঠে তিনটে রঙিন ফোঁটা—সাদা, নীল আর সবুজ। আঙুল বুলালে বোঝা যায়, ফোঁটাগুলো একটু ফোলা। টিপলে সামান্য দেবে যায়। ওগুলো কী আমরা জানি না। আর ডিস্কটার একপিঠে ঠিক মাঝখানটায় প্ল্যাস্টিকের খুদে বুদ্বুদের ভেতর রয়েছে অত্যন্ত ছোট কী একটা জিনিস। আমাদের টেকনিশিয়ানরা সন্দেহ করছেন ওটা সেলফ-ডেসট্রাকশান সুইচও হতে পারে। দ্বিতীয় আইডি কার্ডটা—যেমন হয় আর কী।

লোকটার কাছ থেকে একটা ডায়েরিও পাওয়া গেছে। সেটা থেকে জানা গেছে কোন্ রুট ধরে কবে তার ইজরায়েলে ফিরবার কথা।

'তো যাই হোক, ওই আইডি নিয়ে, অর্থাৎ নকল রানার পরিচয় নিয়ে ইজরায়েলে ঢুকছ তুমি। রুটটা ইলোরা জানে।'

কথা শেষ করে হাতের ফোল্ডারটা রানার দিকে ঠেলে দিলেন বিসিআই চিফ।

ওটা নিয়ে রানা দরজার কাছে চলে এসেছে, পিছন থেকে আবার বললেন বৃদ্ধ, 'ও, ভাল কথা। আমাদের টেকনিকাল ডিপার্টমেন্ট হলুদ কয়েকটা প্রজাপতি বানিয়েছে। এক-আধটা সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো, কাজে লাগতে পারে।'

'জী, সার!'

দুই

সেদিন দুপুরের ফ্লাইটেই লেবাননের রাজধানী বৈরুতের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রানা। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছে, অথচ শুরু থেকেই রোমাঞ্চ অনুভব করবার বদলে কেন জানি খুঁতখুঁত করছে ওর মনটা।

এক লোক, মোসাদের এজেন্ট, ওর ছদ্মবেশ নিয়ে জঘন্য সব অপরাধ করে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সে তার অপরাধের তালিকা একটা ডায়েরিতে লিখে রাখবে কেন? পরবর্তী অপারেশন আর কর্মসূচিই বা কেন লেখা থাকবে সেই ডায়েরিতে? এটা তো যে-কোনও স্পাইয়ের অক্ষমণীয় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

লোকটাকে মেরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু মোসাদ তা জানে না।

বেশ, ভাল কথা। আগামীকাল ওই নকল রানার কাজ হবে লেবাননের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে খুন করা। সে বেঁচে নেই, কাজেই লেবানিজ প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর কোন বিপদও নেই। তার পরদিন, অর্থাৎ পরশু নির্দিষ্ট একটা রুট ধরে নকল রানার হাইফা হয়ে তেল আবিবে ফিরবার কথা। তার জায়গায় রানা যাচ্ছে, স্বভাবতই ওকে প্রশ্ন করা হবে কী কারণে লেবানিজ প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে খুন করা হয়নি। নিজেকে রানা মনে করিয়ে দিল, এই প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য একটা জবাব তৈরি করে রাখতে হবে ওকে।

এই কর্মসূচি আর রুট সম্পর্কে ডায়েরিতে বিশদ লেখা আছে। ইলোরার কাছ থেকে পাওয়া ডায়েরিটা উল্টেপাল্টে দেখবার সময় রানার মনে প্রশ্ন জেগেছে—অন্য কারও রুট, সে জীবিত থাকুক বা না থাকুক, অনুসরণ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? বিশেষ করে দু'জনেই যদি এসপিওনাজ এজেন্ট হয়?

ইলোরার কাছ থেকে রানা জেনেছে কীভাবে লোকটা মারা গেল। গত শুক্রবার ইয়াসির আরাফাতের বিশ্বস্ত সহকারী মোহাম্মদ জাকির আসলামকে খুন করে জর্দানের রাজধানী আম্মানে পালিয়ে আসে ওই নকল রানা। আম্মানে তার কাজ ছিল জর্দানী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে খুন করা।

বিসিআই এজেন্টরা তার খোঁজে চোখ-কান খোলা রেখেছিল, এয়ারপোর্টে দেখেই চিনে ফেলে। ফাইভ স্টার হিলটন হোটেলে ওঠে সে।

বিসিআই-এর তিনজন এজেন্ট 'রুম সার্ভিস' বলে ঢুকে পড়ে তার হোটেল স্যুইটে। ওদের উদ্দেশ্য ছিল লোকটাকে ইন্টারোগেট করা, তারপর, যদি সম্ভব হয়, বন্দি করে ঢাকায় নিয়ে আসা।

কিন্তু লোকটা খালি হাতে একাই তিনজনকে মেরে প্রায় তক্তা বানিয়ে ফেলে। অগত্যা উপায় না দেখে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, গুলি করতে বাধ্য হয় ওরা। দুটো গুলি করা হয়, দুটোই বুকে।

পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো ছিল, গুলির আওয়াজ তাই

বাইরে থেকে কেউ শুনতে পায়নি। ডেডবডি আর স্যুইট সার্চ করে আইডি ডিস্ক আর ডায়েরিটা পায় ওরা। তারপর লাশ একটা ট্রলিতে তুলে স্যুইট থেকে বেরিয়ে আসে। একটা সার্ভিস ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে আসে হোটেল থেকেও। কাছাকাছি ফাঁকা মরুভূমিতে এসে লাশটাকে বালির নীচে পুঁতে ফেলে ওরা। শীতের রাত, কেউ ওদেরকে দেখেনি।

ওই ডায়েরিতে লেখা প্রোগ্রাম থেকে জানা গিয়েছিল, পরদিন জর্দানী প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে খুন করবে নকল রানা। যেহেতু সে বেঁচে নেই, তাই জর্দানী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরও বিপদের কোন ভয় নেই।

কিন্তু পরদিন ঠিকই খুন হয়ে গেছেন জর্দানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

বিসিআই এজেন্টরা বুঝতে পারল, নকল রানার মৃত্যুর কথা জানতে পেরে মোসাদের অন্য কোন এজেন্ট ওই খুনটা করেছে।

এ-সব ঘটনা একজন এসপিওনাজ এজেন্টকে খুঁতখুঁতে করে তুলবার জন্য যথেষ্ট। রানার মনে অনেক প্রশ্ন জাগছে, যেগুলোর উত্তর জানবার কোন উপায় নেই ওর।

ডায়েরি কেন?

ডায়েরির প্রতিটি এন্ট্রি কয়েকবার করে রিপিট করা হয়েছে কেন?

আইডি ডিস্কের সাংকেতিক চিহ্ন আর ফোঁটাগুলোর তাৎপর্য কী? এক পিঠে ওটা কিসের সুইচ?

জর্দানী প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে কে খুন করল? তিনি খুন হওয়ার পর বালি খুঁড়ে কি পরীক্ষা করা হয়েছে নকল রানার লাশ সেখানে আছে কি নেই? লাশটা বালির নীচে পুঁতবার আগে পালস্ ইত্যাদি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল তো যে সে সত্যিই মারা গেছে?

করাচি, দুবাই আর কুয়েতে বিরতি নিয়ে রানার প্লেন বৈরুতের আকাশ সীমায় পৌঁছাতে যাচ্ছে। রাত এখন গভীর। কিন্তু ওর

চোখে ঘুম নেই। করাচি থেকে মেক্সিকোর মাধ্যমে ইজরায়েলে একটা টেলেক্স পাঠিয়েছিল ও। দুবাই-এ পৌঁছে সেই টেলেক্সের জবাব পেয়েছে। ওর বন্ধু রিকার্ডো বারকুচি জানিয়েছে, রানা যেন ওর সঙ্গিনীকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে, ওদেরকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যই করা হবে।

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বসের দেওয়া শাকিলা মেহরুনের ফোল্ডারটা পকেট থেকে বের করল রানা। ওর সিটের আলোটা জ্বেলে মনোযোগ দিল পড়ায়। সমস্ত তথ্য সরল ভাষায় সাজালে মেয়েটির গল্প দাঁড়ায় এরকম:

তেল আবিবের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে শাকিলা মেহরুনের জন্ম। মা-বাবা দু'জনেই নৃত্যশিল্পী ছিলেন, সেই সূত্রে শাকিলাও ছোটবেলা থেকে নাচ শিখেছে। পনেরো বছর বয়স, স্কুল ফাইনাল দেবে সে, এই সময়ই ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের এজেন্টরা তার মা-বাবাকে ইয়াসির আরাফাতের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধরে নিয়ে যায়, তারপর টরচার করে মেরে ফেলে। শাকিলা আশ্রয় পেল বাপের বাল্যবন্ধু, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কর্নেল, চিরকুমার অরওয়েল জারকার বাড়িতে। বেচারি জানত না এই জারকাই তার মা-বাবাকে নির্যাতন করে মেরেছে।

যাই হোক, লেখাপড়া এবং নাচের কোর্স ভালভাবেই শেষ করেছে শাকিলা। তারপর নৃত্যশিল্পী হিসাবে খুব দ্রুত নাম করে ফেলে সে। তার নাচের খ্যাতি ইজরায়েল ছাড়িয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্য আর ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মা-বাবা স্পাই ছিল, স্বভাবতই ইজরায়েল সরকার শাকিলার উপর খুব কড়া নজর রাখে। কালচারাল ট্যুরে মাঝে-মধ্যে বিদেশে পাঠাতে হয় তাকে, তখন নজরদারি বহুগুণ বেড়ে যায়। তবে এ-সবই চলে খুব গোপনে, শাকিলার চোখের আড়ালে।

ইজরায়েল সরকার মুসলমানদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ

করে না, দুনিয়ার মানুষকে এটা বোঝাবার জন্য দেশে এবং বিদেশে শাকিলাকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। ইহুদি সমাজের উপর মহলে তার অবাধ আসা-যাওয়া আছে।

তিন বছর আগে লন্ডনে শো করতে এলে বিসিআই-এর তরফ থেকে সোহেল আহমেদ শাকিলার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেছিল। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আর মোসাদ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় থাকায় বিসিআই সম্পর্কে শুনেছে সে, জানে ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের ভীষণ একটা মাথাব্যথার নাম হলো মাসুদ রানা।

মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ পেয়ে শাকিলা জানায়, ইজরায়েলের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেলে অবশ্যই ছাড়বে না সে। সোহেল তখন বিসিআই-এর এজেন্ট হিসাবে কাজ করবার প্রস্তাব দেয় তাকে। ঝুঁকি আছে জেনেও রাজি হয় শাকিলা। সোহেলের সঙ্গে একটা মৌখিক চুক্তি হয় তার: ইজরায়েলের সামরিক এবং অন্যান্য গোপন তথ্য একজন রানারের মাধ্যমে বৈরুতে পাচার করবে সে। এই কাজের বিনিময়ে বিসিআই তার নামে একটা সুইস ব্যাঙ্কে এক লক্ষ মার্কিন ডলার জমা রাখবে। আরেকটা শর্ত হলো, তিন বছর পর শাকিলাকে ইজরায়েল থেকে বের করে আনবে বিসিআই, তার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করবে।

সেই তিন বছর পুরো হওয়ার পর শাকিলা মেহরুন এখন ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

বিসিআই তাকে জানিয়েছে, একজন এজেন্টকে তেল আবিবে পাঠানো হচ্ছে; ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীর গোপন প্রজেক্ট সম্পর্কে খোঁজ নিতে সাহায্য করবে তাকে তুমি, তারপর সে তোমাকে ইজরায়েল থেকে বের করে আনবে।

বাথরুমে ঢুকে ফোল্ডারটা ছিঁড়ে কমোডে ফেলল রানা, তারপর ফ্লাশ করে বেরিয়ে এসে নিজের সিটে বসল। মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে ও। ভীষণ অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

একজন শত্রুর পূর্ব-নির্ধারিত রুট আর প্রোগ্রাম ধরে ইজরায়েলের মত নরকে ঢুকতে যাওয়াটাকে কী বলা যায়? কোনও পাগলও তো এই কাজ করতে চাইবে না।

তারপর, নকল রানা তেল আবিবের যেখানে এবং যাদের কাছে ফিরছিল, ওকেও সেখানে ঠিক তাদেরই কাছে পৌঁছাতে হবে। কে জানে সেখানে ওর জন্য কী ধরনের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মা-বাবার মত শাকিলাও যে একজন স্পাই, এ কথা সম্ভবত ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের অজানা নেই। তা না হলে শাকিলার কনট্যাক্টকে নকল রানা খুন করবে কেন?

হাতঘড়ি দেখল রানা। রাত দুটো।

একটু পরই বৈরুত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল ওদের প্লেন। কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল রানা। 'শেরাটনে চলো,' ড্রাইভারকে বলল ও।

হোটেল শেরাটনের একটা স্যুইট আগেই বুক করা হয়েছে। রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে তিনতলার কফি হাউসে চলে এল রানা। দীর্ঘ প্লেন জার্নির ক্লান্তি দূর করতে ব্র্যান্ডি মেশানো এক কাপ কফির বুঝি কোন তুলনা নেই।

এগারোতলায় ওর স্যুইট। ভিতরে ঢুকে কাপড়চোপড় খুলল রানা, তারপর বিছানায় উঠে বুক পর্যন্ত টেনে নিল কম্বল। শুতে না শুতে ঘুম চলে এল চোখে।

ঘুম ভাঙল দুপুর বারোটায়। বিছানায় উঠে বসে চোখ রগড়াল রানা। তারপর বেরিয়ে এল সিটিংরুমে, খবরের কাগজটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকবে।

দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে 'দা ডেইলি লেবানন' দিয়ে গেছে রুম সার্ভিস। মেঝে থেকে সেটা তুলে বাথরুমের দিকে ঘুরে গেল রানা।

বাথরুমের দরজার কাছে পৌঁছেছে, কাগজের হেডিংটা প্রচণ্ড এক ঘুসির মত আঘাত করল ওকে: 'গভীর রাতে বোমা বিস্ফোরণে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিহত!'

তিন

একটা কম্বল টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়েছে রানা, সিটিংরুমের সোফায় বসে রুম সার্ভিসের দিয়ে যাওয়া কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে।

ব্যাপারটা আসলে ঠিক কী ঘটছে? বারবার এই একটা প্রশ্নই জাগছে মনে। কী ঘটছে? কিন্তু উত্তর জানা নেই।

দুই মন্ত্রীকে খুন করবার প্ল্যান ছিল নকল রানার। কিন্তু তার আগে সে নিজে খুন হয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই তাঁদের বিপদ কেটে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা কাটেনি। দুজনেই আততায়ীর গুলি ও বোমা হামলায় মারা গেছেন, দু'জনের আততায়ীই খুন করবার পর পালিয়ে যেতে পেরেছে।

প্রশ্ন হলো, যেখানে নকল রানার অস্তিত্ব নেই, কে তাদেরকে খুন করল?

এরকম জটিল আর বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতিতে ওর কি উচিত হবে নকল রানার রুট ধরে সামনে এগোনো? ইচ্ছে করলে অন্য কোন পথ ধরে ইজরায়েলে ঢুকতে পারে ও।

না, তা ঢুকলে বসের নির্দেশ সরাসরি অমান্য করা হয়।

কাল সকাল ন'টায় পার্লামেন্ট রোডের চৌরাস্তার কাছাকাছি একটা পার্কিং লটে ওর জন্য, অর্থাৎ নকল রানার জন্য একটা লাল

মার্সিডিজ অপেক্ষা করবে। গাড়িটায় ড্রাইভার থাকবে কি না, নকল রানার ডায়েরিতে সে-ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

রানার ঠোঁট জোড়া টানটান হয়ে উঠল, আপন মনে হাসছে ও। উদ্বেগ আর খুঁতখুঁতে ভাব এখনও আছে, তবে অনুভবে রোমাঞ্চ আর উত্তেজনাও এখন প্রবল। এরকম অনিশ্চয়তা আর বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার নামই তো মাসুদ রানা।

পার্কিং লটে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, প্রথমবার চোখ বুলাতেই শেষ মাথায় লাল ঝকঝকে মার্সিডিজটাকে দেখতে পেল রানা। গাড়ির ভিতরে কেউ আছে কি না দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। তবে আশপাশে কোন মানুষজন নেই।

রানার হাঁটবার ভঙ্গিটা শান্ত, তবে পদক্ষেপে দৃঢ়তার কোন অভাব নেই। একটা হাত ট্রাউজারের পকেটে। অপর হাত জ্যাকেটের ভিতর একবার ঢুকেই বেরিয়ে এল। প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারের স্পর্শ মনে এনে দিল সাহস আর স্বস্তি।

গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। সাহস আর স্বস্তি যে মিথ্যে, এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে স্নাইপারের একটা বুলেট মাথার খুলিটা চৌচির করে দিলে। সে-আশঙ্কা একেবারে কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? বিসিআই এজেন্টদের ধারণা, নকল রানার মৃত্যুসংবাদ শত্রুপক্ষ এখনও জানে না। সে ধারণা ভুলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে শত্রুরা জানে নকল রানার আইডি ডিস্ক আর ডায়েরি খোয়া গেছে। ডায়েরিতে পাওয়া রুট ব্যবহার করে ইজরায়েলে ঢুকবার জন্য আসল রানাকে বিসিআই নির্দেশ দিতে পারে, এটা আন্দাজ করে নেওয়া কঠিন কিছুই নয়।

ত্রিশ সেকেন্ড হয়ে গেছে গাড়িটার পাশে পৌঁছেছে রানা। কোন স্নাইপার ওকে লক্ষ্য করছে বলে মনে হয় না। তা হলে কি গাড়িতে বোমা ফিট করা আছে?

মার্সিডিজে তালা দেওয়া নেই। জানালা দিয়ে দেখা গেল

ইগনিশনে চাবি ঝুলছে। শার্টের পকেট থেকে একটা কলম বের করে ক্লিপের মাথায় আঙুল দিয়ে তিনবার চাপ দিল রানা। তারপর টান দিয়ে ড্রাইভিং সাইডের দরজাটা খুলে ফেলল।

পাঁচ গজের মধ্যে কোন বোমা বা বিস্ফোরক থাকলে পিপ্-পিপ্ করে উঠত কলমটা।

ড্রাইভিং সিটে বসে দরজা আর জানালা লক করল রানা। ফুয়েল গজে চোখ পড়তে দেখল ট্যাংক একেবারে ভর্তি। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ও।

বন্দরের একটা নির্দিষ্ট ডকে পৌঁছাতে হবে রানাকে। দ্রুত গাড়ি চালালে ঘণ্টা তিনেক লাগবে। ওখানে ওর জন্য মাঝারি আকারের একটা ফিশিং ট্রলার অপেক্ষা করছে। ওই ট্রলারই ইজরায়েলি বন্দর-শহর হাইফার একটা জেলে পাড়ায় নামিয়ে দেবে ওকে। তারপর ট্রেনে চড়ে এয়ারপোর্টে যাবে ও, সেখান থেকে চার্টার করা প্লেন ধরে পৌঁছাবে তেল আবিবে।

দশ মিনিটও পার হয়নি, মিলিটারি রোড ব্লকে থামতে হলো। গত রাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খুন হয়েছেন, আততায়ীর খোঁজে প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে আরোহীদের কাগজ-পত্র চেক করা হচ্ছে।

লেবাননে রানা বৈধভাবে ঢুকেছে, ব্যবহার করেছে নিজের পাসপোর্ট। এমন কী অস্ত্র বহন করবার লিখিত অনুমতিও নেওয়া আছে। তবে সব কাগজ-পত্র ওর সঙ্গে নেই। জিজ্ঞাসাবাদ, তল্লাশী, যাচাই ইত্যাদি কাজে প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরি হয়ে গেল রানার। সামরিক অফিসাররা মোবাইল ফোনে বাংলাদেশ দূতাবাসসহ আরও দু'এক জায়গায় যোগাযোগ করে রানার পরিচয় এবং অস্ত্র বহন করবার অনুমতি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ছাড়ল না।

সামনে আরও রোডব্লক পড়বে, ঝামেলা এড়াবার জন্য রানাকে একটা পাস দেওয়া হলো। এক এক করে আটটা রোডব্লকে থামতে হলো ওকে। পাস থাকলেই কী, সাধারণ

সৈনিকরা দেখে কিছু বোঝে না। রানাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখল তারা, পাসটা পাঠিয়ে দিল অফিসারের কাছে। এভাবে প্রতিটি রোডব্লকেই প্রচুর সময় নষ্ট হলো। ডকে পৌঁছানোর কথা সাড়ে বারোটার মধ্যে। দেখা গেল বিকেল চারটের পরও সর্বশেষ রোডব্লক থেকে মুক্তি পায়নি রানা।

একে তো ক্লান্তি আর বিরক্তির চরম, তার উপর লাঞ্চ করা হয়নি, শেষ দশ মাইল গাড়ির স্পিড তুলল রানা ঘণ্টায় নব্বুই মাইল। তবে বন্দরে ঢুকবার মুখে আবার থামতে হলো। তল্লাশী চালাচ্ছে নৌ-বাহিনীর লোকজন। আরও আধঘণ্টা নষ্ট হলো এখানে।

শীতের দিন, পাঁচটার খানিক পরেই চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। ডায়েরিতে লেখা আছে পাঁচ নম্বর ডকের কাছে গাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এরপর পায়ে হেঁটে পৌঁছাতে হবে সতেরো নম্বরে।

সতেরো নম্বর ডক এরিয়ায় আলো খুব কম, কারও সঙ্গে রানার দেখাও হচ্ছে না। কুয়াশা এদিকটায় বেশ গাঢ়, ঠাণ্ডাও বেশি।

সুটকেসটা হাত বদল করে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সামনেই সতেরো নম্বর জেটি, অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে ও। আশপাশে কেউ আছে বলে মনে হলো না। জেটির শেষ মাথায় কী আছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সাবধানে এগোল রানা। ভাবছে জেটিতে যদি কোন ফিশিং ট্রলার না থাকে, তা হলে কী করবে ও? আর যদি থাকে…সেটা ওর জন্য পেতে রাখা কোন ফাঁদ নয় তো?

কুয়াশার ভিতর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো নিঃসঙ্গ বালবের আলো আর ট্রলারের আকার। একেবারে ছোট নয় ট্রলারটা। তবে বেশ পুরানো। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে আর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ করছে।

হিম বাতাসে শ্বাস নিতেও কষ্ট পাচ্ছে রানা। জেটির কিনারায়

পৌঁছানোর আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। জ্যাকেটের কলার দিয়ে ঘাড় ঢাকল ও।

'হ্যালো?' গলা চড়িয়ে ডাকল রানা। 'বোটে কেউ আছেন নাকি?'

'অ্যাঁ?' একটু দেরি করে সাড়া পাওয়া গেল। আরও একটু দেরি করে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। কোটের কলার উপরে তুলে মুখটা যেন ঢাকতে চাইছে সে।

'আপনিই কি ক্যাপটেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

লোকটা ক্যাবিনের ছায়া পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল। পাকা চুল-দাড়ি নিয়ে ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের একজন বুড়োকে দেখছে রানা। 'ইয়েস,' বলল সে, শুনতে লাগল–'আ।' তারপর বলল, 'বোটে উঠে পড়ো তুমি। সোজা নীচে নেমে বিশ্রাম নাও। আমরা এখনই রওনা হব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। লাফ দিয়ে বোটে উঠছে, ক্যাবিন ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। তার হাঁটবার ভঙ্গিটা বিসদৃশ লাগল ওর, কেমন যেন আড়ষ্ট।

ডেকে দড়িদড়ার ঝাপটা লাগবার আওয়াজ পেল ও। ভাবল বোটে ক্যাপটেনকে যেহেতু একা মনে হচ্ছে, তাকে ওর সাহায্য করা উচিত কি না। ডেকে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট অপেক্ষা করল ও, দু'একবার কাশল, কিন্তু লোকটা ওকে ডাকল না।

হেঁটে হ্যাচের কাছে চলে এল রানা, সেটা গলে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নীচে নামল। দু'দিকে বেঞ্চসহ একটা টেবিল দেখা যাচ্ছে, ডানদিকে বড়সড় গ্যালি, নাক বরাবর আরেক দরজার ওদিকে একটা বাঙ্ক। সেদিকে পা বাড়াল রানা। ভাবল, প্রথমে একটু জিরিয়ে নিই, তারপর জেনে নেওয়া যাবে খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা।

ডেকের উপর লোকটার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। ভারী আরও কিছু রশি আছড়ে পড়ল ডেকে। তারপর যান্ত্রিক

গুঞ্জন উঠল, পরমুহূর্তে গর্জে উঠল শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিন।

কিছুক্ষণ আগু-পিছু করে অবশেষে রওনা হয়ে গেল ট্রলার। ক্যাবিন উঠছে আর নামছে। পোর্টহোল দিয়ে রানা দেখতে পাচ্ছে বৈরুতের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে।

ক্যাবিনে হিটিং সিস্টেম নেই, ভিতরটা যেন বাইরের চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা। সাগর উত্তাল; বেশি উঁচু ঢেউগুলোর ঝাপটা রেইল টপকে এসে পোর্টহোলও ভিজিয়ে দিচ্ছে।

অসম্ভব ক্লান্ত রানা। রোডব্লকগুলো ওর সমস্ত শক্তি যেন শুষে নিয়েছে। সুটকেসটা নামিয়ে রেখে জ্যাকেট না খুলেই বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। পায়ের কাছ থেকে কম্বলটা টেনে নিল গায়ে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার উপর অসম্ভব দোল খাচ্ছে ট্রলার, অথচ তা সত্ত্বেও ঘুম চলে এল চোখে।

মনে হলো এইমাত্র চোখ বুজেছে, অথচ কী একটা শব্দে তন্দ্রাটা ছুটে গেল। ট্রলারের দোল আর ঝাঁকি এখন আর ততটা জোরাল লাগছে না। হঠাৎ করেই কারণটা ধরতে পারল রানা। ইঞ্জিন নিস্তেজ করে রাখা হয়েছে। ওদের গতি আগের মত দ্রুত নয়।

এখনও চোখ বুজে আছে রানা। ভাবছে। সাগর খুব বেশি উত্তাল বলেই কি গতি কমিয়ে রেখেছে ক্যাপটেন?

এই সময় আবার আওয়াজটা শুনতে পেল রানা।

ইঞ্জিনের চাপা গর্জন সত্ত্বেও ক্যাবিনের ভিতরটা প্রায় নীরবই বলা যায়। শব্দটা শুনে মনে হলো রানার সরাসরি উপরের ডেকে কেউ যেন হাঁটাচলা করছে। শব্দটা আবার হলো। যতবার শুনছে রানা, আরও সহজে বুঝতে পারছে ঠিক কোত্থেকে আসছে।

আওয়াজটা বাইরে নয়, হচ্ছে এই নীচেই কোথাও। হাত দিয়ে আড়াল করে সামান্য একটু চোখ মেলল রানা। এবার পরিষ্কার টের পেল কীসের শব্দ। চাপ পড়ায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে কম্প্যানিয়নওয়ের ধাপ। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে কেউ একজন নীচে

নামছে।

ক্যাপটেনের ভারী কোটটা চিনতে পারল রানা। তবে নীচে আলো এত কম যে মুখটা এখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

কম্প্যানিয়নওয়ের নীচে নেমে টেবিলের কিনারা ধরে তাল সামলাল বুড়ো, তারপর আরও সাবধানে এগোল। তার হাতে কিছু একটা আছে। অন্ধকারে রানা যেমন তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তেমনি সে-ও নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে না যে ওর চোখ দুটো সামান্য খোলা।

ক্যাবিনের দরজায় দাঁড়াল। বাঙ্কের দিকে তাকিয়ে রানাকে দেখছে। এই প্রথম রানা লক্ষ করল, বুড়োর কাঠামোটা বেশ লম্বা-চওড়া। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কি ওর পরিচিত? হ্যাঁ...এমন কাউকে বোধহয় চেনে ও, যে এই ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। মনে পড়ছে না কে।

আবার এগোচ্ছে বুড়ো।

চোখের উপর একটা হাত রেখে শুয়ে আছে রানা। তবে অন্তত একটা চোখ পুরোপুরি চাপা পড়েনি। লোকটার ডান হাতে ধারাল, চকচকে একটা ছুরি। বাম হাতও খালি নয়।

ছুরির প্রয়োজনটা বোঝা যায়, কিন্তু টর্চ দিয়ে কী করবে বুড়ো?

রানার অপর হাতটা কম্বলের তলায়, পিস্তল ধরে আছে। তবে একান্ত বাধ্য না হলে লোকটাকে গুলি করবে না ও। বাঁচিয়ে রাখলে কেন কী ঘটছে অনেক কিছুই বলানো যাবে এই বুড়োকে দিয়ে।

টর্চের আলো পড়ল রানার মুখে। বাঙ্কের একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। পেন্সিল টর্চের ম্লান আলোয় খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। আরও ভাল করে দেখবার জন্য ঝুঁকল একটু।

রানা কিছুটা বিমূঢ়। ওকে এভাবে দেখবার কী আছে? ছুরি মারবার আগে লোকটা কী নিশ্চিত হতে চাইছে, ও মাসুদ রানা কি

না? নিশ্চয় তাই হবে। তাই বলে এতক্ষণ ধরে দেখবে? যেন মনে হচ্ছে…দেখে আশ মিটছে না!

তারপর লোকটা সিধে হলো। দেখা শেষ। এবার ছুরি ধরা ডান হাত উপরে তুলল। কুয়াশা ভেদ করা, পোর্টহোল গলে ভিতরে ঢুকে পড়া চাঁদের নিষ্প্রভ আলোয় ঝিক করে উঠল রুপালি ফলা। উপরে তোলা হাত নেমে এল সবেগে।

রানার শরীরে আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেছে। শরীরটাকে গড়িয়ে নাগালের বাইরে সরিয়ে আনল ও। বাঙ্কটা যথেষ্ট চওড়া, পৌঁছে গেল বাল্কহেডে।

বিছানায় ছুরি গাঁথার ভোঁতা আওয়াজ হলো, তারপরই শোনা গেল ধারাল ফলা দিয়ে ম্যাট্রেস চেরার শব্দ। প্রায় কোন বিরতি ছাড়াই বাল্কহেড থেকে আবার উল্টোদিকে গড়াল রানা, হাতের পিস্তল কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখেছে।

লোকটার ছুরি বিছানার ম্যাট্রেসে এখনও গাঁথা রয়েছে, তার হাতের কবজিটা দু'হাতে চেপে ধরল রানা, প্রায় একই সঙ্গে হাঁটু দিয়ে মারল লোকটার মুখে।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে পিছু হটল লোকটা, তবে রানার মুঠো থেকে তার কবজিটা বেরিয়ে গেল। ভারসাম্য ফিরে পেতে সময় নিচ্ছে সে, ততক্ষণে বাঙ্ক থেকে নীচে নেমে পড়ল রানা, হাঁটু বরাবর ঝেড়ে লাথি চালিয়েছে।

এই লাথিটাও লাগল। সরাসরি হাঁটুর উপরেই। পিছাল লোকটা। তবে রানাও একটু পিছাতে বাধ্য হলো। লোকটার শরীর যেন স্প্রিঙের সমষ্টি।

চিন্তা করবার সময় নেই রানার, কারণ লোকটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। তবে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে ওর মনে: এরকম প্রচণ্ড লাথি খেয়েও লোকটা কোন শব্দ করল না কেন? তার তো ছিটকে পড়ে যাওয়ার কথা, তার বদলে শুধু পিছু হটল কেন?

এগিয়ে এসে ছুরি ধরা হাতটা আবার তুলল বুড়ো। ঝট করে

সেই হাতের তলায় ঢুকে পড়ল রানা, গোড়ালিতে ভর দিয়ে লাটিমের মত আধপাক ঘুরল, আবার ধরে ফেলল সেই একই কবজি, তারপর মাথা তুলল সবেগে–লোকটার চিবুকে বাড়ি খেল ওর শক্ত খুলি।

খোলা মুখ বন্ধ হওয়ার ভোঁতা আওয়াজ পেল রানা। কবজিটা বাঙ্কহেড়ে আছড়াল ও, মুঠো থেকে খসে গিয়ে শূন্যে উড়ল ছুরি, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

টেবিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মুখোমুখি লড়ছে ওরা। রানার বাম হাত লোকটার গলা টিপে ধরেছে, ডান হাতের মুঠোয় তার কবজি।

কবজিটা ছেড়ে দিয়ে ঘুসি চালাল রানা লোকটার চোয়ালে। একবার। দুইবার। তিনবার।

চুল-দাড়ি খুলে এল লোকটার। চতুর্থ ঘুসিটা স্থির হয়ে গেল শূন্যে। রানা স্তম্ভিত।

নকল চুল আর দাড়ি আসলে মুখোশের অংশ। লোকটাকে চিনতে পারছে রানা। চেনে বলেই তার দাঁড়িয়ে থাকবার ভঙ্গিটা ওরকম পরিচিত লাগছিল।

লোকটা বুড়ো নয়। রানা নিজেকেই দেখছে নিজে। এ নিশ্চয়ই সেই নকল বা ছদ্মবেশী রানা।

আশ্চর্য, লোকটা তা হলে মরেনি? আরও আশ্চর্য, ছদ্মবেশ কখনও এত নিখুঁত হয়?

চার

রানার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগছে, সেই সুযোগে ওর ঊরুসন্ধি লক্ষ্য করে হাঁটু চালাল হুবহু একই চেহারার শত্রু। নিখাদ রিফ্লেক্স অ্যাকশনের কল্যাণে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিতে পারল রানা, ফলে গুঁতোটা লাগল পায়ে, তা সত্ত্বেও ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল ও। ওর কাঁধে ধাক্কা দিল লোকটা, তারপর ঘুরে কম্প্যানিয়নওয়েের দিকে ছুটল।

লাফ দিয়ে পিছন থেকে তার কোটটা খামচে ধরল রানা। টের পেয়ে শরীরটা ঝাঁকাল সে–ভঙ্গিটা ঠিক পানিতে ভেজা কুকুরের মত, তবে আরও অনেক প্রবল বেগে। কোটটা যেন কেউ হ্যাঁচকা টান দিয়ে বের করে নিল রানার মুঠো থেকে। কোনও মানুষের শরীরে এত শক্তি থাকতে পারে, বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

লাফ দিয়ে আবার তাকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হলো রানা। ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে সে। পড়িমরি করে পিছু নিল ও।

উপরে উঠে আসতেই ঠাণ্ডা হিম বাতাস যেন ছুরি চালাল চোখে-মুখে। যতটা ধারণা করেছিল তার চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটছে ট্রলার। একটা টুল বক্সের দিকে ঝুঁকে রয়েছে লোকটা। এক মুহূর্ত সময় পেয়ে লোকটার নাম রাখল রানা ডাবল। ভেজা ডেকে একবার ওর পা পিছলাল। এখানে দাঁড়িয়ে লোকটাকে সামলানো যাবে না, বুঝতে পেরে কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা বের করতে গেল ও।

পিস্তলের বাঁটে হাত পৌঁছেছে কি পৌঁছায়নি, বড় একটা

পাইপ রেঞ্চ ঘোরাল ডাবল, টার্গেট করেছে ওর মাথাটাকে।

হাত তুলে সেটা ধরে ফেলল রানা। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। রানাকে অনায়াসে ল্যাং মেরে ডেকে ফেলে দিল ডাবল। রানা তাকে না ছাড়ায় সে-ও ধপাস করে ওর পাশে পড়ল।

ট্রলারের দোল ওদেরকে একদিক থেকে আরেকদিকে গড়াতে বাধ্য করছে। মোটা একপ্রস্থ রশির একটা কুণ্ডলীতে ধাক্কা খেল ওরা। ডাবলের রেঞ্চ ধরা হাতটা শক্ত করে চেপে রেখেছে রানা। টান দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় রানা দেখল, ডাবল হাসছে। প্রথমে রানার মনে হলো, ভুল দেখছে। তারপর শিরদাঁড়ায় ভয়ের একটা হিম স্রোত বয়ে গেল। হাসতে হাসতে, প্রায় অনায়াসে, রেঞ্চ ধরা হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে।

আরও বিস্ময়—না কি বিপদ—অপেক্ষা করছিল। রেঞ্চ নিয়ে সিধে হলো ডাবল, সময় দিল রানাকেও সিধে হওয়ার। নিজের পায়ে দাঁড়াবার সময় বেল্টে হাত দিল রানা।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। পিস্তলটা নেই। ধস্তাধস্তির কোনও এক ফাঁকে কোমরের বেল্ট থেকে ডাবল সেটা বের করে নিয়েছে।

তার একটা হাত পিছনে ছিল, রানার চোখে চোখ রেখে এখন সামনে নিয়ে এল। ওয়ালথারটা দেখাল রানাকে। তারপর নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে পিচ্ছিল ডেকের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে।

'কে তুমি?' কণ্ঠস্বর এত কর্কশ, নিজের বলে রানা চিনতেই পারল না।

'আমি মাসুদ রানা,' বলল ডাবল, তার কণ্ঠস্বরও কর্কশ। 'তুমি কে? আমার চেহারা নকল করেছ…কী মতলবে?'

'তামাশা হচ্ছে, না?' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'ভেবেছ…'

'আমার আইডি ডিস্ক আর ডায়েরিটা তোমাদের লোকজন নিয়ে গেছে,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল ডাবল। 'কোথায় রেখেছ বলো, ওগুলো আমার খুব দরকার।'

'ওগুলো এতই যদি দরকার তোমার, প্রথমে সুটকেস সার্চ না করে টর্চ জ্বেলে আমার মুখে কী খুঁজছিলে?'

'একই চেহারা আর পরিচয় নিয়ে দু'জন মানুষ দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে পারে না,' বলল ডাবল। 'তোমাকে আবর্জনায় পরিণত করার আগে দেখে নিচ্ছিলাম ওরা আমাকে হুবহু তোমার মত তৈরি করতে পেরেছে কিনা।'

'হোয়াট?' রানার ধারণা, শুনতে ভুল করেছে। 'কী বললে?'

'কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল,' বলল ডাবল। 'ওগুলো কোথায় রেখেছ বললে বলো, না বললেও ক্ষতি নেই। আজ, এখানে, এখনই আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে–তারপর সার্চ করে ওগুলো আমি খুঁজে নিতে পারব।'

'তা পারবে। ঠিক আছে, দিচ্ছি ওগুলো। তবে মরার আগে দু'একটা কৌতূহল যদি মেটাতে, আমার আত্মা হয়তো শান্তি পেত।'

'আত্মা? শান্তি পেত?' বিমূঢ়, বিহ্বল দেখাল ডাবলকে। 'কিন্তু আমি তো জানি তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। আমাকে বলা হয়েছে, আত্মায় বিশ্বাস করে শুধু গর্দভরা।'

'শোনা কথা বিশ্বাস না করাই ভাল,' বলল রানা। 'এই যেমন আমি শুনেছি যে তুমি মারা গেছ, অথচ কথাটা সত্যি নয়।'

'না, কথাটা সত্যি নয়। আমি মরিনি। খুশি? তোমার কৌতূহল মিটল? এবার দাও ওগুলো।'

'মরোনি, সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলল রানা। 'কারণটা ব্যাখ্যা করবে না? বলবে না, এখানে আমার জন্যে ফাঁদ পেতেছিলে কী মনে করে...জানলে কীভাবে যে আমি আসছি?'

হাসল লোকটা। 'কারণ জানতে চাও? এক–ওরা আমাকে নয়, ভুলবশত অন্য লোককে গুলি করে বালিতে পুঁতে রেখেছিল। দুই–যাকে তোমরা মেরেছ, আমি সে লোক নই। এই চেহারার আরও বহু লোক আছে, আমি তাদের একজন। তিন–'

‘তুমি মিথ্যে কথা বলছ। একটু আগে আইডি ডিস্ক আর ডায়েরিটা চেয়েছ, বলেছ ওগুলো তোমার। তোমাকেই গুলি করে বালিতে পোঁতা হয়েছিল।’

‘তুমি শালা সত্যিই খুব চালাক,’ হুবহু রানার কণ্ঠস্বর নকল করে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বাংলায় কথাটা বলল ডাবল। ‘ঠিক ধরে ফেলেছ।’

তাজ্জব হয়ে গেল রানা লোকটার মুখে বাংলা শুনে। বলল, ‘তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ। জানলে কীভাবে যে এখানে আমি আসছি?’

হাসল ডাবল। ‘আমাকে বালিতে পোঁতার সময় তোমাদের লোকজন বলাবলি করছিল–এবার নিশ্চয়ই মাসুদ ভাইকে পাঠাবেন বস্...’

‘তুমি বাংলা শিখলে কোত্থেকে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এ-ধরনের নগণ্য, তাৎপর্যহীন প্রশ্ন করে তুমি কিন্তু আমার বিরক্তি উৎপাদন করছ!’ বলেই হঠাৎ হাতের রেঞ্চটা রানার মাথা লক্ষ্য করে সবেগে চালাল ডাবল।

রানা প্রস্তুত ছিল না, তবে রিফ্লেক্স অ্যাকশন-এর কল্যাণে বেঁচে গেল এ-যাত্রাও। ঝট করে বসে পড়েছে ও। টার্গেট মিস করায় তাল হারাল ডাবল, কুঁজো হয়ে গেল। মাথাটা ডাবলের পেটে ঠেকিয়ে আবার সিধে হচ্ছে রানা। লোকটার দুই হাঁটু ধরে ঠেলে দিল উপর দিকে।

রানার পিছনে, ডেকে মাথা দিয়ে পড়ল ডাবল। ভেজা ডেকে শব্দটা খুব জোরে হলো–নির্ঘাত খুলিটা ভেঙে গেছে ডাবলের।

ঘুরে তাকাতে রানা দেখল ডেক থেকে অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াচ্ছে ডাবল, হাত দিয়ে পানি ঝাড়ছে কোট থেকে। চেহারা দেখে মনে হলো না কোথাও এতটুকু ব্যথা পেয়েছে সে।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। পরমুহূর্তে যে ঘুসিটা ডাবলের মুখে মারল, দেখবার সুযোগ পেলে মোহাম্মদ আলি দি গ্রেটও বোধহয়

প্রশংসা না করে পারত না। প্রথমে পরপর কয়েকটা ঘুসি, তারপরই বাঁ পায়ের উপর ঘুরে ডান পা দিয়ে হাড় ভাঙবার উপযোগী প্রচণ্ড একটা মারণ কিক।

ডাবলের গলা থেকে আহত পশুর মত কাতর গোঙানি বেরিয়ে এল। ডেকে ছিটকে পড়ল সে। হাত থেকে রেঞ্চটা ছুটে গেল, গড়ান দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

রানা চিন্তিত। মুখ, পাঁজর, বুক, কাঁধ—ডাবলের যেখানেই মারল, মারগুলো যেন প্রতিবার পিছলে গেল। লোকটা কোট আর শার্টের নীচে কিছু কি পরে আছে—রাবারের তৈরি?

ডাবলের মুখটাই বা কী? মুখোশ নয় তো?

ট্রলারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টলছে রানা। ও বুঝতে পারছে, ইজরায়েলে ঢুকতে হলে ওর এই ডাবলকে আপাতত অচল করে রাখতেই হবে, অন্তত যতদিন ওর অ্যাসাইনমেন্ট শেষ না হয়। লোকটা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ালে তার ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পাবে না ও।

এগোবার সময় হোঁচট খাচ্ছে রানা। ওর ডাবল গড়িয়ে অন্ধকারে চলে গেছে। পিচ্ছিল ডেকে দু'তিনবার পা পিছলাল রানার, একবার একটুর জন্য রেইলিং টপকে সাগরে পড়ল না।

বড় একটা ঢেউ বোটের বো-র উপর মাথা তুলল, বিরাট একটা স্রোতের মত ডেক ধরে ধেয়ে আসছে। সেটার সঙ্গে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল ডাবল, একটা হাত মাথার পাশে তোলা।

ডাবলের হাতে ওটা আরেকটা ছুরি, তবে ছোট। তাকে ঠেকাবে কী, ডেকে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব মনে হলো রানার। ডাবলের জুতোয় রাবার সোল রয়েছে, কিন্তু রানা পরে আছে স্ট্রিট শু্য।

লোকটার মুখে আবার সেই আত্মবিশ্বাসী হাসি দেখতে পেল ও। নিশ্চিতভাবে জানে, রানা হেরে গেছে।

কোন রকমে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করছে রানা। ভাব দেখে মনে হলো লোকটা কাছে চলে এলে তাকে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করবে।

রানাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে ছুরি চালাল ডাবল। রানাও নিজের হিসাব করা সময়ে লাফ দিয়েছে। এক হাতে ডাবলের চুল খামচে ধরেছে ও, একই সময়ে ভাঁজ করা হাঁটুটা তলপেটে ঠেকিয়ে তুলে দিতে চেষ্টা করছে বুকে।

কয়েকটা বিষয় সাহায্য করল: ডাবলের সামনে বাড়ার ঝোঁক; তার মাথার চুল ধরে টানছে রানা; বুক আর পেটের মাঝখানে এঁটে বসা হাঁটু তার শরীরটাকে উপরে তুলল।

তার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখল রানা, ওর মুখটাকে যখন সেটা পাশ কাটাচ্ছে। তারপর এক সেকেন্ডের জন্য চেঁচিয়ে উঠল সে। তার চুল ছেড়ে দিল রানা।

রানার ডাবল ডিগবাজি খেল শূন্যে। শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে আর মোচড়াচ্ছে, সে যেন শূন্যে বাঁক নিয়ে হাওয়ায় ক্রল করে ফিরে আসতে চাইছে। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। স্টারবোর্ড রেইল ছাড়িয়ে গেছে সে। তারপর পতন শুরু হলো। আলোড়িত সাগর অবশ্য সামান্যই ছলকাল।

ঘুরে ট্রলারের পিছন দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, ভাবল লোকটাকে হাবুডুবু খেতে দেখতে পাবে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

আবার ঘুরে টলতে টলতে এগোল রানা। প্রথমে ওয়ালথারটা খুঁজে বের করল, তারপর মই বেয়ে উঠে এল ফ্লাইং ব্রিজে। কন্ট্রোলের সামনে দাঁড়িয়ে সাগরের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করছে। ট্রলার এত বেশি দুলছে, সতর্ক না হলে ওকেও পড়ে যেতে হবে।

থ্রটল টেনে এনে পোর্টের দিকে হুইল ঘোরাল রানা। একটা ঢেউয়ের গা বেয়ে উপরে চড়ল ট্রলার, নীচে নামল প্রায় আড়াআড়ি ভঙ্গিতে। থ্রটল সামান্য ঠেলে দিয়ে ট্রলারকে ঘোরাল

ও, যেদিকে হারিয়ে গেছে ওর ডাবল।

বাতাস আর ছলকানো পানির ছিটা হাজার হাজার সুচের মত বিঁধছে মুখে। আঙুলগুলো এত ঠাণ্ডা, কোন সাড় নেই।

উইন্ডশীল্ডের মাথার দিকে বড় একটা স্পটলাইট ফিট করা রয়েছে। থ্রটল একটু টেনে এনে স্পট লাইটটা জ্বালল রানা। কালো ঢেউগুলোর উপর চোখ ধাঁধানো আলোর বৃত্তটাকে ঘোরাচ্ছে। ঢেউগুলো অনবরত ভাঙছে, রাশি রাশি সাদা ফেনা টগবগ করে ফুটছে। আর কিছু দেখবার নেই। তারপরও বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে বেশ কিছুক্ষণ খুঁজল রানা।

এরকম উত্তাল মাঝ–সাগরে হিম-শীতল পানিতে পড়বার পর, কারও বেঁচে থাকবার প্রশ্নই ওঠে না। অন্তত রানার তাই মনে হলো।

কিন্তু নিখুঁত একটা ডাবল, যত্নের সঙ্গে বাংলা ভাষা পর্যন্ত শেখানো হয়েছে যাকে, তাকে সাঁতারটা শেখানো হয়নি কেন?

পাঁচ

ভোর হওয়ার অনেক আগেই শান্ত হয়ে এল সাগর। তবে ট্রলারটা যতই ইজরায়েলের দিকে এগোচ্ছে, ততই অশান্ত হয়ে উঠছে রানার মন।

কথা ছিল এই ফিশিং ট্রলার ইজরায়েলি বন্দর নগরী হাইফার কাছাকাছি একটা জেলে পাড়ায় পৌঁছে দেবে রানার ডাবলকে। তাকে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বোটে নিশ্চয়ই কেউ ছিল; রানার ডাবল রানাকে খুন করবে বলে তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

ফলে রানাকে এখন নিজের চেষ্টায় পৌঁছাতে হবে জেলে পাড়াটায়। হাইফা শহরটা ওর আংশিক চেনা আছে, তবে ট্রেন স্টেশনে কখনও যায়নি। ও জানে না স্টেশনে ওর জন্য, অর্থাৎ ওর ডাবলের জন্য, কেউ অপেক্ষা করবে কি না।

চার্টার করা প্লেনটাই বা ও চিনবে কীভাবে?

শান্ত সাগর, দৃষ্টিপথের ভিতর অন্য কোন জলযান নেই, হুইল লক করে দিয়ে হ্যাচ গলে আরেক বার ক্যাবিনে নেমে এল রানা। সার্চ করে দেখবে ওর ডাবল সম্পর্কে নতুন আরও কিছু জানা যায় কি না।

একটা ক্লজিটে জুতো আর কাপড়চোপড় রয়েছে, সবই রানার মাপের। বাঙ্কের মাথার কাছে একটা লকার আছে, তবে চাবিটা পাওয়া গেল না।

ক্লজিট থেকে পাওয়া ব্রিফকেসটা বেশ ভারী মনে হলো। তবে চাবি না থাকায় এটাও খোলা যাচ্ছে না।

সবশেষে টেবিলের দেরাজ খুলল রানা। ভুরু দুটো একটু কুঁচকে উঠল। ভিতরে ছোট্ট একটা নোটবুক দেখা যাচ্ছে।

সেটা তুলে নিয়ে পাতাগুলো দ্রুত ওল্টাল রানা। ডাবলের ডায়েরির মত এটাতেও প্রতিটি এন্ট্রি রিপিট করা হয়েছে, অর্থাৎ একই কথা বারবার লেখা হয়েছে। যেমন, পরপর কয়েকটা জায়গায় লেখা হয়েছে কবে, কখন, কোথায় হত্যা করা হবে জর্দানি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর লেবাননী প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে। এ যেন কাউকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

নোটবুকে আরও কিছু এন্ট্রি পাওয়া গেল—অদ্ভুতই বলতে হবে। যেমন, এক জায়গায় রানার ডাবল লিখেছে—'আমি অফিসের ঠিকানা ভুলে গেছি।' আরেক পাতায় বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা নিজের চেহারা এঁকে নীচে আঞ্চলিক বাংলায় লিখেছে: 'এমনিতেই মাথার একটা ইস্ক্রু ঢিলা আছিল; অহন, ডাণ্ডা খাওনের পর, মনে কয় আরও দুই-একডা ইস্ক্রু লড়বড় লড়বড় করতাছে।'

মনে হয়, ওকে ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে রানা এজেন্সির কেউ বোধহয় ওর মাথায় আঘাত করেছিল। তবে ওর ডাবল ওর মত সতর্ক, তা বলা যাবে না। টেবিলের দেরাজেই পাওয়া গেল ব্রিফকেস আর লকারের চাবি। কিছু ইজরায়েলি মুদ্রাও রয়েছে, কাজে লাগবে রানার।

ব্রিফকেসটা ভারী, কারণ তাতে ঠেসে ভরা হয়েছে বান্ডিল বান্ডিল আমেরিকান ডলার। ব্যাঙ্কডাকাতি করে পাওয়া তিন বস্তার অংশ বিশেষ, সন্দেহ নেই। সবগুলো পাঁচশো ডলারের নোট। প্রতি বান্ডিলে দুশো করে। বিশটা বান্ডিল। তারমানে বিশ লাখ ডলার।

লকার খুলে শুধু একটা পিস্তল পেল রানা।

ওয়ালথার।

ট্রলার নিয়ে হাইফা উপকূলে পৌঁছাতে প্রায় সকাল হয়ে গেল। জেলে পাড়াটা কোথায়, রেলস্টেশনটা কোনদিকে, কোথাকার টিকিট কিনে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে হবে, চার্টার করা প্লেন চিনবার উপায় কী ইত্যাদি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখন রানার জানা। এ-সব তথ্য সম্ভবত নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নোটবুকে লিখে রেখেছিল রানার ডাবল। শুধু লিখে রাখেনি, ম্যাপ এঁকে জলবৎ তরলং করেও রেখেছে।

সেই ম্যাপ অনুসরণ করে জেলে পাড়াটা খুঁজে বের করল রানা। পাহাড়ের পাশে প্রাচীন, বিধ্বস্ত একটা কেল্লা আছে, ওখান থেকে তিনশো গজ দক্ষিণে।

নোঙর ফেলে তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে ট্রলার থামাল রানা, সৈকতে পৌঁছাল ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে।

জানে এখন থেকে হিব্রু ভাষায় কথা বলতে হবে, একজন জেলেকে প্রশ্ন করে জেনে নিল রানা ঠিক জায়গায় এসেছে কি না। রেল স্টেশনটা গ্রামের ঠিক বাইরে, মেইন রোডের পাশে।

হেঁটেই রওনা হয়েছিল, তবে গরুর গাড়িতে বসা দেহাতী ক'জন লোক ডেকে নিয়ে নিজেদের পাশে বসতে দিল ওকে।

স্টেশনে পৌঁছে লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটল রানা, গন্তব্য হাইফা বন্দর সংলগ্ন নতুন এয়ারপোর্ট।

নিজের কাপড়চোপড় ফেলে দিয়ে ওর ডাবলের পোশাক পরেছে রানা—সাদা শার্ট, ধূসর রঙের গরম কাপড়ের সুট। কোটের পকেটে ইজরায়েলি সিগারেট।

ট্রেনে চড়বার আগে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ব্রেক ফাস্ট সারল রানা। আশপাশে বেশির ভাগই ইহুদি, তবে বেশ কিছু মুসলমান আর খ্রিস্টানও আছে। দেখেই বোঝা যায়, খুব আড়ষ্ট পরিবেশ।

রানা তাদের অচেনা, ফলে সবাই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কারও চোখে সরাসরি না তাকিয়ে নাস্তা সারল ও, কাউন্টারে বিল মিটিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল প্ল্যাটফর্মে।

ডান হাতের লাঠি দিয়ে বাম হাতের তালুতে সশব্দে বাড়ি মারতে মারতে কাছে চলে এল ইউনিফর্ম পরা একজন সশস্ত্র পুলিশ। প্রথমে আড়চোখে, তারপর সরাসরি তাকাল রানার দিকে। চোখাচোখি হতে ভদ্রতাসূচক মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

ইউনিফর্ম কিন্তু হাসল না। তার ভুরু কুঁচকে উঠেছে, তাকিয়ে আছে রানার পায়ের পাশে রাখা সুটকেসটার দিকে।

মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী বোমার ভয়ে অষ্টপ্রহর আতঙ্কিত হয়ে আছে ইজরায়েলিরা। এই পুলিশ ব্যাটা নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে সুটকেসে বোমা আছে। এখন যদি খুলতে বলে?

সুটকেসের ফলস বটমে রানার নিজের পিস্তলটা লুকানো আছে, সার্চ করলেও সেটা কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু রানা ওর ডাবলের ব্রিফকেসটা এই সুটকেসের ভিতরই ঢুকিয়ে রেখেছে,

তার পিস্তল আর বিশ লাখ ডলারসহ, ওগুলোর কী হবে?

পুলিশ লোকটা অত্যন্ত বেআদব। রানাকে মাঝখানে রেখে চক্কর দিচ্ছে সে, মুহূর্তের জন্যও ওর উপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। এ এক ধরনের মানসিক নির্যাতন। তবে রানার জন্য ব্যাপারটা গাত্রদাহর কারণ হয়ে উঠল।

পকেট থেকে আইডি ডিস্কটা বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, নিচুগলায় বলল, 'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স।' অপরহাতে বেরিয়ে এল ওর ডাবলের ওয়ালথারটা। 'দৌড়ে পালাও, তা না হলে অসম্মান করার অপরাধে খুলি উড়িয়ে দেব।'

ডিস্কটা নিল না, তার বদলে স্মার্ট ভঙ্গিতে রানাকে স্যালুট করল পুলিশ লোকটা। একা শুধু সে নয়, আশপাশের আরও অনেকে সম্মানজনক দূরত্বে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

ট্রেন আসতে রানা যে কমপার্টমেন্টে উঠল তাতে আর কেউ উঠল না। প্রায় খালি বগি। গন্তব্যে পৌঁছাতে সময় লাগল মাত্র এক ঘণ্টা।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল রানা। ওকে এক লোকের নিতে আসবার কথা। পরনের এই সুট আর ব্রিফকেস আর মুখে সিগারেট দেখে ওকে চিনবে সে। সুটকেস থেকে ব্রিফকেসটা বের করে ফুটপাতে নামিয়ে রাখল রানা।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেল। সেই জোঁকটা! সম্ভবত একই ট্রেনে চড়ে এসেছে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, গালভর্তি হাসি নিয়ে হেঁটে আসছে ওর দিকে।

রানা চিন্তিত। ইউনিফর্ম পরা, নিঃসঙ্গ একজন পুলিশ কেন ওর আশপাশে ঘুর-ঘুর করবে?

লোকটা সেই আগের ভঙ্গিতেই স্যালুট করল আবার।

'কী চাও তুমি?'

'সার, আমিই তো আপনার এসকর্ট,' সহাস্যে বলল লোকটা। 'এয়ারপোর্টে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'নিতে এসেছ ভাল কথা। কিন্তু ওখানে কী করতে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম কর্নেল জারকা আর কর্নেল হেজাজীর নির্দেশে, সার,' বলল ইউনিফর্ম। 'ওঁরা ভয় পাচ্ছিলেন, আপনি না আবার ভুল কোন ট্রেনে উঠে পড়েন...'

'থাক, এত বকবক করতে হবে না,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে, তোমার গাড়ি কই?'

'ওই যে, সার, মিলিটারি ব্যারাক থেকে নিয়ে এসেছি–নীল পাজেরো।' রানাকে পথ দেখিয়ে গাড়িতে এনে তুলল এসকর্ট।

এয়ারপোর্টটা কাছেই, পাঁচ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল ওরা। চার্টার করা একটা লিয়ার জেট রানার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওকে পাইলটের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল এসকর্ট।

হাইফা থেকে তেল আবিব পঁয়ত্রিশ মিনিটের ফ্লাইট। ভর দুপুরে টারমাকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে। প্লেনে থাকতেই শুনেছে রানা, আজ ভারী বর্ষণ হতে পারে।

লিয়ার জেট থেমেছে টার্মিনাল ভবন থেকে অনেক দূরে। ধাপ বেয়ে নামবার পর ওর জন্য তিনজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। বুকের ভিতরটা ধুক-ধুক করছে–এখন থেকে ওর অগ্নিপরীক্ষা শুরু হলো।

দু'জনকে পিছনে রেখে তাদের একজন হাসিমুখে এগিয়ে এল। ইলোরার কাছে এই লোকের ফটো দেখেছে রানা। এ হলো কর্নেল মারকুইজ হেজাজ, মোসাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। মেরিন রিসার্চ ল্যাবে যে গোপন এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, তার অন্যতম সিকিউরিটি চিফও বটে। তবে রানা ঠিক বুঝতে পারছে না এই লোক কেন ওকে নিতে এসেছে। আসবার কথা তো কর্নেল জারকার।

এগিয়ে এসে ডান হাতটা সটান বাড়িয়ে দিল রানা। কিন্তু

হাতটাকে গ্রাহ্য করল না কর্নেল হেজাজ, পাশ কাটিয়ে এসে নিজের বুকে টেনে নিল রানাকে।

'আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার—মাসুদ রানা!' রানার পিঠ চাপড়ে দিল মোসাদ কর্মকর্তা। 'গুড টু সি ইউ এগেন। এক হাজার সৈন্য যা পারবে না, তুমি একা সেই কেরামতি করে দেখিয়েছ—কংগ্রাচুলেশন্স!'

হাসল রানা। 'ধন্যবাদ। আমিও খুশি।'

হাঁটতে শুরু করে কর্নেল হেজাজ রানার কাঁধে একটা হাত তুলে দিল। 'কাল রাতেই সিদ্ধান্ত হয় ইজরায়েলের সবচেয়ে দামি সিলেব্রিটিকে আমরা, সিকিউরিটি কর্মকর্তারা, রিসিভ করতে আসব। ল্যাবে একটা সমস্যা দেখা দেয়ায় কর্নেল জারকা আসতে পারলেন না, তাই আমাকে একা আসতে হয়েছে। কাস্টমসকে বলা আছে, কাজেই তোমাকে কেউ চেক করছে না। এখন থেকে তোমাকে আর রিসার্চ সেন্টারের সেই পুরানো ঠিকানায় থাকতে হবে না, তোমার জন্যে একটা ফাইভ স্টার হোটেলের স্যুইট বুক করা হয়েছে। এতগুলো সাকসেসফুল অপারেশনের পর নিশ্চয়ই বিশ্রাম দরকার তোমার।' দু'জন লোকের একজনকে রানার সুটকেসটা আনতে পাঠাল সে।

রানার মনে পড়ল, কর্নেল হেজাজ বিবাহিত। 'আপনার স্ত্রী আর বাচ্চারা কেমন আছে, সার?'

'ভাল, সবাই ভাল—ধন্যবাদ।' হঠাৎ ঠোঁট মুড়ে সবজান্তার হাসি হাসল কর্নেল হেজাজ। 'জানি, হে, জানি,' সকৌতুকে বলল আবার, 'ডক্টর ডেব্রা আব্রাহামের সঙ্গে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে আছ তুমি, তাই না?' কনুই দিয়ে রানার পাঁজরে আদুরে একটা গুঁতো মারল। 'তবে সাবধান কিন্তু!' হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠল সে। 'ডেব্রা আমাদের খুবই দামি একজন বিজ্ঞানী, কোন অবস্থাতেই তাঁর প্রেগন্যান্ট হওয়া চলবে না। ওদিকটা এখনও আনচার্টেড গ্রাউন্ড, এক্সপ্লোর বা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়নি। তুমি

তো সবই বোঝো—আশা করি কিছু মনে করছ না?'

রানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল—'কী আনচার্টেড? কী এক্সপ্লোর বা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়নি?' শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল ও। তবে বিস্ময়ের একটা বেশ জোরাল ধাক্কাই খেয়েছে।

ডেব্রা আসলে কে? তার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা দৈহিক মিলনের অনুমতিও দেয়? বিয়ে করা বউ নয় তো? কিন্তু তা হলে ওর দ্বারা ডেব্রার প্রেগন্যান্ট হতে অসুবিধে কী? বিপদটা কোথায়?

'ইয়েস, সার,' বলল রানা, হঠাৎ খেয়াল করল ওর দিকে কেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেল হেজাজ, যেন কিছু শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে। 'মানে, না, সার, আমি কিছুই মনে করছি না।'

'গুড। ওই তোমার সুটকেস এসে গেছে। তোমার জন্যে পাম বিচ ইন্টারন্যাশন্যালে একটা স্যুইট বুক করা হয়েছে। তবে প্রথমে তুমি নিশ্চয়ই একবার ল্যাবে যাবে, তাই না?'

লোকটার হাত থেকে সুটকেসটা নিল রানা। তার সঙ্গীটারও প্রায় একই চেহারা, যমজ হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। এরা বোধহয় কর্নেল মারকুইজ হেজাজের বডিগার্ড। 'ল্যাবে? নাহ, এখন নয়। পরে। আমি খুব ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম নিতে চাই।'

টার্মিনাল ভবনের বাইরে দুটো কালো সিডান অপেক্ষা করছে। রানাকে নিয়ে সামনেরটায় উঠল কর্নেল হেজাজ, পিছনেরটায় বাকি দু'জন। তেল আবিব অভিমুখে ছুটে চলা যানবাহনের মিছিলে সামিল হলো ওরা। শহরে গিজ-গিজ করছে সামরিক বাহিনীর লোকজন।

'তোমার স্মৃতিশক্তির কী অবস্থা?' হঠাৎ জানতে চাইল কর্নেল হেজাজ। রানা ল্যাবে যাবে না শুনবার পর কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

'ভাল নয়।' মাথা নাড়ল রানা। 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব ভুলে যাচ্ছি। লিখে রাখলে মনে করতে সুবিধে হয়, তবে লেখাটা

বেশি পুরানো হয়ে গেলে, পড়লেও সব মনে পড়তে চায় না।'

'হুম।' গম্ভীর দেখাল কর্নেল হেজাজকে, পকেট থেকে দুটো চুরুট বের করে একটা গুঁজে দিল রানার হাতে। 'তোমার দুর্বল স্মৃতিশক্তি বিরাট একটা সমস্যাই বটে। তবে চিন্তার কিছু নেই, এটারও সমাধান বেরিয়ে যাবে। ল্যাবে রাত-দিন গবেষণা চলছে। কি জানো, এ হলো ডক্টর অটার আর ডক্টর বিয়েট্রিচ উলফের শয়তানি।'

কিছুই রানা বুঝল না, তবে নাম দুটো মনে গেঁথে রাখল—অটার উলফ আর বিয়েট্রিচ উলফ। নাম শুনে বোঝা যায় দু'জনেই জার্মান।

'তোমার আসলে খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলা দরকার,' কর্নেল হেজাজই আবার নীরবতা ভাঙল। 'ভুলে গেলে তো বিপদে পড়ে যাবে। আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, নিশ্চয়ই খুব রোমাঞ্চকর আর ইন্টারেস্টিং হবে। ভাল কথা, মারা যাবার আগে "রানার" লোকটা গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য দিয়েছে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। ওর ডাবলের নোটবুকটা ভাল করে পড়া থাকায় জবাব দিতে খুব সুবিধে হচ্ছে: 'সার, আপনি জানেন যে মোসাদ, বা এমন কী মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকেও আমি রিপোর্ট করব না। আমি রিপোর্ট করব সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মিস্টার শ্যারনকে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' হেসে উঠল কর্নেল হেজাজ, আওয়াজটা একটু বেসুরো। 'আমি আসলে তোমার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।'

হোটেলটা ফাইভ স্টার। রানার জন্য একটা স্যুইট আগেই বুক করা হয়েছে, ওকে শুধু খাতায় সই করতে হলো।

রানার সঙ্গে একা শুধু কর্নেল হেজাজ রিসেপশনে এসেছে, যমজ দেহরক্ষীদের পার্কিং লটে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

'বারে বসি?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল হেজাজ। 'ভদকা মেশানো

এক কাপ কফি খেলে শরীরটা তোমার ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

'দুঃখিত, সার। এরকম একটা জার্নির পর আমি সত্যি ক্লান্ত। কিছু মনে করবেন না, আমি এখন বিশ্রাম নেব।'

'কিন্তু, আমি ভেবেছিলাম,' চেহারা ম্লান হয়ে গেল মোসাদ কর্মকর্তার, 'অন্তত কিছুক্ষণ আমরা আলাপ করব।'

'পরে, কর্নেল হেজাজ। এখন আমাকে মাফ করতে হবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ম্লান হাসিটা থাকল মুখে, তবে টান টান। 'নির্বিঘ্নে বিশ্রাম নাও, রানা। আমরা পরে আলাপ করব।'

'ও, একটা প্রশ্ন,' বলল রানা। 'রিয়াদে আপনাদের দু'জন এজেন্টের হাতে তিন বস্তা ডলার তুলে দিয়েছিলাম—ওগুলো ঠিকমত পেয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'দেড় কোটি ডলার গুণে নিয়েছেন?' জানতে চাইল রানা। 'ছিল এক কোটি সত্তর লাখ। বিশ লাখ আমার ব্রিফকেসে আছে।'

'হ্যাঁ, গুণে নেয়া হয়েছে। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল হেজাজ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম,' বলে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে গেল মোসাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।

ইশারায় একজন পোর্টারকে বিদায় করে দিয়ে নিজেই সুটকেস হাতে এলিভেটরের দিকে এগোল রানা। বারোতলায় উঠে স্যুইটে ঢুকল। প্রথম কাজ কোথায় কী আছে দেখে নেওয়া। তিন কামরার স্যুইট; দুটো ঝুল-বারান্দা, একটু ঝুঁকি নিলে উপরে বা নীচতলার ঝুল-বারান্দায় ওঠা কিংবা নামা যাবে।

লুকানো ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন পাওয়া গেল না।

নক হলো।

দরজা খুলতে একজন পোর্টারকে দেখল রানা, হাতে বিরাট রুপালি ট্রে। ট্রের উপর এক বোতল হুইস্কি—শিভাস রিগাল—আর এক গোছা রজনীগন্ধা রয়েছে। সামান্য একটু মাথা নোয়াল

পোর্টার। 'কর্নেল মারকুইজ হেজাজের তরফ থেকে শুভেচ্ছা, সার।'

'টেবিলে রেখে যাও।'

নির্দেশ পালন করে আরেকবার মাথা নুইয়ে চলে গেল পোর্টার। হাতে গ্লাস নিয়ে ডেস্কের সামনে চলে এল রানা, টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে ভাবছে হুইস্কি পাঠানোর জন্য কর্নেল হেজাজকে একটা ধন্যবাদ দেবে কি না। চিন্তাটা বাতিল করে দিল। কে জানে এরই মধ্যে ও ভুল-ভাল কিছু করে বসেছে কি না–ভুল, কিংবা ওর ডাবলের আচরণের সঙ্গে মানায় না, এমন কিছু? এয়ারপোর্ট থেকে আসবার পথে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়েছিল লোকটা। কিছু কি সন্দেহ করে বসেছে?

জানালার সামনে চলে এল রানা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গ্লাসে চুমুক দিল। তারপর হাসল আপন মনে।

রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা চেয়েছিলে না? নাও কত নেবে।

চমকে দিল ডেস্কের ফোনটা। এগিয়ে এসে রিসিভার ধরল রানা, বড় করে শ্বাস টেনে বুকটা ভরল, তারপর ওটা কানে তুলে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'মাসুদ রানা।'

খসখসে নারীকণ্ঠ ভেসে এল। 'মিস্টার রানা, সার, হোটেল অপারেটর। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে কোন কল এলে প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি সেটা ধরবেন কি না।'

'ঠিক আছে। কার ফোন বলো।'

'শাকিলা মেহরুন, সার। কলটা কি আপনি রিসিভ করবেন?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, ভাবছে, এত তাড়াতাড়ি শাকিলা ওকে ফোন করছে–ব্যাপারটা কী? পরমুহূর্তে আরেকটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল লাইনে, যেমন মার্জিত তেমনি মিষ্টি।

'মিস্টার মাসুদ রানা?' বলল মেয়েটা। 'ওয়েলকাম ব্যাক টু তেল আবিব। নতুন পরিচয়, আমাকে আপনি ভুলে যাননি তো?'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'পরিচয় না থাকলেও তো আপনার

মত সিলেব্রিটিকে কেউ ভোলে না।' কথা শেষ হতেই মনে পড়ল, ওর ডাবলের স্মরণশক্তি খুবই দুর্বল, অর্থাৎ জবাবটা যথাযথ হয়নি। প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি বদলাতে চাইল ও: 'আমি কৃতার্থ, আমার মত সামান্য একজন মানুষকে আপনি মনে রেখেছেন।'

'আপনি অসামান্য, মিস্টার রানা। আপনি সত্যিকার অর্থে ইউনিক। এ-সব আমি আপনার সম্পর্কে জেনেছি আপনি বিদেশে চলে যাবার পর।' সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাকিলা মেহরুন। 'তবে ডক্টর অটার আর ডক্টর বিয়েট্রিচ উলফ বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন আপনি ঠিক কী ধরনের মানুষ।'

আবার সেই দুই জার্মান ডক্টরের প্রসঙ্গ। তবে কর্নেল হেজাজের সুরে তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ছিল, আর শাকিলার কণ্ঠে রয়েছে অকুণ্ঠ প্রশংসা। রানা ভাবল: অসামান্য আর ইউনিক বলবার পর প্রশ্ন তোলা হচ্ছে আমি ঠিক কী ধরনের মানুষ। এর মানে?

'আমি নিজেও জানি আমি কী ধরনের মানুষ,' বলল রানা।

'বাহ্, কী আশ্চর্য, তা কেন জানবেন না! নো অফেন্স, মিস্টার রানা! এ প্রসঙ্গ বরং থাক। পরিচয় তো মাত্র দু'মিনিটের, পরস্পরকে বলতে গেলে আমরা ভাল করে চিনিই না। তবে আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই আমি জানি। কর্নেল জারকা আমাকে বলেছেন।'

'কর্নেল অরওয়েল জারকা, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে আমার ইমিডিয়েট বস্।'

'উনি মেরিন ল্যাবে কী একটা কাজে আটকা পড়েছেন, তবে সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই বেরুতে পারবেন।'

'ডক্টর আর কর্নেলদের প্রসঙ্গ বাদ দিন, আপনি বরং বলুন আপনার সঙ্গে দেখা করবার কী উপায়।'

অপর প্রান্তে হেসে ফেলল শাকিলা মেহরুন। 'আমি সেজন্যেই ফোন করেছি আপনাকে। আপনি কি আজ রাতে

আমার নাচ দেখতে আসবেন? অনুষ্ঠানের পর ছোট একটা পার্টি আছে, আমরা হয়তো নির্জন কোথাও কিছুক্ষণ বসার সুযোগ পাব।'

'তা হলে তো ভালই হয়, ধন্যবাদ।'

'তা হলে রাতে দেখা হচ্ছে, কেমন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

কিছুটা কাকতালীয় ব্যাপারই বলতে হবে যে ওর কনট্যাক্ট শাকিলা মেহরুন নিজে থেকে যোগাযোগ করল। সে কি জানে ও আসল মাসুদ রানা, তাকে ইজরায়েল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা থেকে এসেছে? মনে হয় না। কী করে জানবে?

এখন থেকে রানার ভুল করবার আশঙ্কা শুধু বাড়তেই থাকবে। শাকিলা দেখা যাচ্ছে ওর ডাবলকে চেনে। ওর সঙ্গে দেখা করবে নকল রানা মনে করে। দু'জনের চেহারা হুবহু এক হওয়ায় বোঝানো বেশ শক্তই হবে যে ইজরায়েল থেকে তাকে বের করবার জন্য পাঠানো হয়েছে ওকে।

শাকিলার নাচের অনুষ্ঠানে এমআই কর্মকর্তা কর্নেল অরওয়েল জারকাও সম্ভবত আসছে। সে যেহেতু নকল রানার বস্, তার চোখে ওর ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা শতকরা একশো ভাগই।

কর্নেল হেজাজ আর শাকিলা, দু'জনেই বলল ল্যাবে কী একটা সমস্যা দেখা দেওয়ায় কর্নেল জারকা খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। বিসিআইকে পাঠানো রিপোর্টে শাকিলা কি এই ল্যাবের কথাই বলেছে?

শাকিলাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে কোথায় সেটা, কী নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সেখানে।

পিপ্-পিপ্ করে উঠে আবার ওর চিন্তায় বাধা দিল টেলিফোনটা। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। 'ইয়েস?'

আবার সেই হোটেল অপারেটর। 'আরেকটা কল, সার—ডেব্রা

আব্রাহাম কথা বলতে চান।'

রানা দ্রুত চিন্তা করছে। এই ডেব্রা আব্রাহামের সঙ্গে ওর ডাবলের সম্পর্কটা কী? ব্রিফ করবার সময় এর সম্পর্কে ওকে কিছু বলা হয়নি।

'সার?' তাগাদা দিল অপারেটর।

সিদ্ধান্ত নিতে আরও দুসেকেন্ড সময় নিল রানা। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তবে এরপর সবাইকে না বলে দিতে হবে। আমি বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করছি।'

'ইয়েস, সার।'

এক মুহূর্ত পর প্রায় কর্কশ একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এল। 'রানা, ডার্লিং, তুমি আমার এখানে না এসে ওখানে কী করছ?'

'ডেব্রা,' উৎফুল্ল একটা ভাব এনে বলল রানা। 'তোমার গলা শুনে কী ভাল যে লাগছে!'

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না। তুমি এক্ষুনি আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো, ডার্লিং। হুইস্কির বড় বোতল, এক গাদা ফুল আর বিছানার জন্যে নতুন চাদর কিনে অপেক্ষা করছি, অথচ তুমি উঠেছ হোটেলে। এটা কী হচ্ছে বলো তো?'

স্ত্রী? বান্ধবী? রক্ষিতা? কে? কী বলবে বুঝতে পারছে না রানা। কর্নেল হেজাজ তার সম্পর্কে শুধু একটাই তথ্য দিয়েছে– ডেব্রা একজন বিজ্ঞানী। কীসের বিজ্ঞানী? কাকতালীয়ভাবে সেই মেরিন ল্যাবে কাজ করে না তো?

ওকে তার ফ্ল্যাটে যেতে বলছে। কিন্তু ফ্ল্যাটটা কোথায় তা-ই তো রানা জানে না।

'রানা? তুমি লাইনে নেই?'

'আছি, ডার্লিং,' ইতস্তত করছে রানা। 'কী জানো, আমি খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে চাই।'

'ক্লান্ত রানা আমার কাছে না এসে হোটেলে উঠবে? এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?' ডেব্রার কণ্ঠস্বরে অভিমান নয়,

অবিশ্বাস। 'রানা, সত্যি করে বলো তো, কী হয়েছে তোমার? তুমি কি এখন আর আমাকে ভালবাস না?'

'আরে, কী বলছ!'

'নাকি ভুলে গেছ আমাকে?' হঠাৎ যেন নার্ভাস হয়ে পড়ল ডেব্রা। 'তোমার স্মৃতি এত দুর্বল, সেরকম কিছু ঘটলে মোটেও আমি আশ্চর্য হব না...'

'আরে না, দূর, তোমাকে কী আমি ভুলতে পারি!'

'পারা তো অবশ্যই উচিত নয়,' জোর দিয়ে বলল ডেব্রা। 'কারণ, জানোই তো, তোমাকে যাঁরা মাসুদ রানা বানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম।'

বানিয়েছে? কারা? কীভাবে? নকল রানা কী মানুষ ছিল না, ছিল বানানো–হাসি পেল রানার–নাহ্, তা কী করে হয়!

বানানো শব্দটার আরও অনেক অর্থ আর ব্যাখ্যা থাকতে পারে। গড়ে-পিটে মানুষ করাকেও বানানো বলা হয়। এমন তো হতেই পারে যে ডেব্রা নকল মাসুদ রানাকে নিখুঁত ছদ্মবেশ নিতে সাহায্য করেছে। সে হয়তো কসমেটিক বা প্লাস্টিক সার্জারিতে দক্ষ।

'শোনো, ডেব্রা ডার্লিং, তেল আবিবে যে-ক'দিন আছি তোমার সঙ্গেই কাটাতে চাই,' বলল রানা। 'কিন্তু আজ রাতে বোধহয় সময় বের করতে পারব না।' ইতিমধ্যে ধারণা করে নিয়েছে, ওর ডাবলের গার্লফেন্ড ডেব্রা। 'বিদেশে যেসব অপারেশন শেষ করে এলাম, ওগুলোর রিপোর্ট লিখে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কাল সকালেই জমা দিতে হবে...'

প্রতিবাদ জানাল ডেব্রা। 'কী আশ্চর্য! ওরা কী ধরে নিয়েছে তোমার বিশ্রাম নেয়ার দরকার নেই?'

'আরে, ওদের কথা আর বোলো না। ওরা আমাকে মানুষ মনে করে নাকি?'

'তুমি বরং ওদের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ!' উত্তেজিত হয়ে

পড়েছে ডেব্রা। 'মানুষই বা বলছি কেন? আমি জানি তুমি অতি মানব। আমি তোমাকে প্রায় সুপারম্যান বলে মনে করি। ডক্টর অটার আর ডক্টর বিয়েট্রিচ উলফ নরকে পচবে, কারণ তারা যদি শয়তানি না করত তা হলে তোমাকে আমরা আরও নিখুঁত, এক্কেবারে ত্রুটিহীন করে গড়তে পারতাম...'

'থামলে কেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল রানা। 'নিজের বৈশিষ্ট্য আর প্রশংসা শুনতে ভালই তো লাগছে।'

'মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল, দুঃখিত,' বলল ডেব্রা, নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'শোনো, ডার্লিং। তোমার সম্পর্কে কে কী ভাবল না ভাবল তা নিয়ে তুমি মোটেও মাথা ঘামাবে না, দুঃখও পাবে না। শুধু আমার কথা মনে রাখবে তুমি। মনে রাখবে একটা মেয়ে তার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে ভালবাসে তোমাকে।'

'তা আমি সব সময় মনে রাখি, ডেব্রা,' বলল রানা, ভাবছে–কিন্তু আমার ডাবল তা হলে কী জিনিস? ডেব্রাও জার্মান দুই ডাক্তারের কথা তুলল। ডাবলকে বলল অতি মানব, বলল প্রায় সুপারম্যান। আসলে কী বলতে চাইছে?

'শোনো, রানা, কাজ শেষ হওয়া মাত্র আমাকে তুমি ফোন করে জানাবে, ঠিক আছে?' বলল ডেব্রা। 'মনে রেখো তোমার অপেক্ষায় ঘরে বসে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটব সারাক্ষণ।'

'কথা দিলাম, ডার্লিং–অবশ্যই ফোন করব,' আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করল রানা।

'সেই অপেক্ষাতেই থাকছি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল ডেব্রা আব্রাহাম।

রিসিভারের দিকে দীর্ঘ পনের সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর ক্রেডলে সেটা নামিয়ে রাখল রানা। এই শীতের মধ্যেও ঘামে ভিজে পিঠে সেঁটে গেছে শার্ট।

ছয়

আমেরিকান ধাঁচে কাটা টাক্সিডো জ্যাকেট পরছে রানা, এই সময় আবার ফোন বেজে উঠল।

ইতিমধ্যে বাইরেটা ম্লান হয়ে এসেছে, বোধহয় বড়সড় একটা ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রস্তুতি চলছে। ব্রিফকেস থেকে বেশ কিছু মার্কিন ডলার বের করে কোমরের বেল্টে রেখেছে রানা, কারণ কখন পালাবার দরকার পড়ে তার ঠিক নেই।

রিসিভারটা তুলল।

হোটেল অপারেটর জানাল: 'লিমাজিন পৌঁছেছে, সার।'

'ধন্যবাদ,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা। ও যেভাবে ভেবেছিল সেভাবে কিছু ঘটতে চাইছে না। ওর ইচ্ছে ছিল শাকিলা মেহরুনের নাচের অনুষ্ঠানে সময়ের আগে পৌঁছাবে, সুযোগ করে নিয়ে নিভৃতে দেখা করবে তার সঙ্গে, উদ্দেশ্য নিজের পরিচয় জানিয়ে রিপোর্ট চাওয়া। কিন্তু তা আর সম্ভব হচ্ছে না।

ডেব্রা আব্রাহামের সঙ্গে ফোনে কথা বলবার পর ইন্টারকমে লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছিল রানা। খাওয়া শেষ হতে বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের সরবরাহ করা ডিভাইসগুলো পরীক্ষা করেছে। তারপরে ঘুম।

দরজায় নক করে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল বেলবয়। সাড়া দিতে বাইরে থেকে সে জানাল, ওর জন্য একটা মেসেজ আছে। রানা

নির্দেশ দিল, দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। তাই দিল বেলবয়। দশ মিনিট পর চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা থেকে নেমে মেঝে থেকে এনভেলাপটা তুলল ও।

নৃত্যানুষ্ঠানের একটা টিকিট ছিল তাতে, সঙ্গে কর্নেল মারকুইজ হেজাজের চিরকুট। চিরকুটটা হিব্রু ভাষায়। তাতে বলা হয়েছে, মেরিন ল্যাবের দুই সিকিউরিটি চিফ, অর্থাৎ কর্নেল হেজাজ আর কর্নেল জারকা, এবং মাসুদ রানা, এক জায়গায় বসে শাকিলা মেহরুনের নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করবে। কর্নেল হেজাজ রানাকে হোটেল থেকে তুলে নেওয়ার জন্য লিমাজিন পাঠিয়ে দিচ্ছে। আরও বলা হয়—প্রথমে তারা ডিনার খাবে, তারপর নাচ দেখবে।

এলিভেটর থেকে নীচের লবিতে বেরিয়ে আসছে রানা, দেখল মেরিন ল্যাবের সিকিউরিটি চিফরা শুধু লিমাজিন পাঠায়নি, ওটার সঙ্গে নিজেরাও চলে এসেছে। পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে দৃঢ় পায়ে তাদের দিকে এগোল ও, ওভারকোটটা ভাঁজ করা হাত থেকে ঝুলছে।

প্রথমে ওকে কর্নেল অরওয়েল জারকা দেখতে পেল। বয়স যাই হোক, লোকটার চেহারা এবং নড়াচড়ায় চিরতরুণ একটা ভাব আছে। হাত বাড়িয়ে সহাস্যে এগিয়ে এল সে। 'মাই ডিয়ার বয়! গুড টু সি ইউ এগেন!' হ্যান্ডশেক করবার সময় অপর হাত দিয়ে রানার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। চাপ বাড়াচ্ছে রানা, বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি নিজের হাতটা ওর হাতের ভিতর থেকে টান দিয়ে বের করে নিল। 'এই!' কৃত্রিম চোখ রাঙাল। 'আবার? মজা করার ছলে কোনদিন না তুমি আমার হাতটা ভেঙে ফেলো!'

তার হাসির সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাসি স্বতঃস্ফূর্ত রাখবার চেষ্টা করল রানা। ওর ডাবল তা হলে তার বসের সঙ্গে মজা করত? 'হ্যালো, বস্! আপনাকে দারুণ হ্যান্ডসাম আর স্মার্ট লাগছে। মনে হচ্ছে, মেয়েদের হৃদয় আর একটাও আস্ত রাখবেন

না।'

সামান্য অপ্রতিভ দেখাল কর্নেল জারকাকে। 'আমাকে মুগ্ধ করতে পারে মাত্র একজনই।'

হেসে উঠল রানা। 'ও, হ্যাঁ, আপনার পোষা ময়না...কী যেন নামটা, প্লিজ? ইদানীং প্রকাশ্যেই আভাস দিচ্ছেন যে তাকে আপনি ভালবাসেন...'

ওর কথা শুনে কর্নেল হেজাজও হেসে উঠল। 'দেখো কাণ্ড! বিদেশে যাবার আগে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো, অথচ নামটাই ভুলে গেছে।'

কর্নেল জারকা বলল, 'তুমি তাকে চেনো, রানা। তবে আজই প্রথম তার নাচ দেখবে।' কথা বলতে বলতে ফ্রন্ট ডোরের দিকে এগোল ওরা।

গাড়ি ছুটছে। শহরটাকে ক্যান্টনমেন্ট মনে হলো রানার, চারদিকে শুধু ট্যাংক, বালির বস্তার আড়ালে মেশিন গান, আর্মারড্ ভেহিকেলের টহল। আর ছুটন্ত অ্যাম্বুলেন্স।

লিমাজিনে উঠবার পর লোকটার রেকর্ড নিয়ে চিন্তা করছে রানা। সুস্থতা আর পাগলামির বর্ডার লাইনে টলছে সে। অত্যন্ত মেধাবি লোক, কিন্তু একই সঙ্গে শিশুর মত আবেগপ্রবণ। শাকিলা মেহরুনকে উন্মাদের মত শুধু ভালই বাসে না, রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা যেন হাতে করে বয়ে বেড়াচ্ছে, সবাই যাতে দেখতে পায়। বিসিআই চিফ রাহাত খানের ধারণা, শাকিলা নিরাপদে ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে বর্ডার লাইন ক্রস করে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হবে এই লোক।

লোকটা আসলে সচল টাইম বোমা, অথচ সবসময় এত হাসিখুশি থাকে, যে-কেউ দেখলেই বলবে তার জীবনটা হাসিখুশি আর আনন্দে টইটুম্বুর।

জিজ্ঞেস না করাটা খারাপ দেখায়, আবার কৌতূহলও হচ্ছে রানার, তাই জানতে চাইল, 'ল্যাবে কী ঘটল বলুন তো?'

‘ও কিছু না,’ এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে জবাব দিল কর্নেল জারকা।

ডিনারে ক্যাভিয়ার ছাড়াও মানুষকে মোটাতাজা করবার হরেক রকম দামী ডিশ পরিবেশিত হলো। আশপাশে যারা খেতে বসেছে সবাই তারা তেল আবিবের বাছাই করা নাগরিক, ডিনার সেরে শাকিলা মেহরুনের নাচ দেখতে যাবে। বাতাসে মৃদু একটা গুঞ্জন আছে, প্রধানমন্ত্রী শ্যারনকে দর্শকদের সারিতে দেখা যেতে পারে। বোধহয় সেজন্যই সিকিউরিটি এত কড়া।

খেতে বসে অনেক কিছু সম্পর্কেই সজাগ থাকল রানা। যেমন–অনুভব করল, মারকুইজ হেজাজ কী কারণে কে জানে চোরা চোখে অত্যন্ত খুঁটিয়ে লক্ষ করছে ওকে। অবশ্য খাওয়া বাদ দিয়ে নয়। সে তার ফর্কে যতটা সম্ভব বেশি খাবার তুলছে, তারপর সেই খাবার হাঁ করা মুখের ভিতর গুঁজে দিচ্ছে। পরমুহূর্তে ন্যাপকিন দিয়ে দ্রুত মুখ মুছছে, ফর্কটা ভরে নিচ্ছে আবার। এ-সবের ফাঁকে বারবার দেখছে রানাকে, তবে কিছু বলছে না। বোঝা গেল, খেতে বসে কথা বলতে পছন্দ করে না কর্নেল হেজাজ।

কর্নেল জারকা অবশ্য ঠিক তার উল্টো। প্রচুর কথা বলছে সে, যদিও তার বক্তব্যে বিষয় মাত্র একটা–শাকিলা মেহরুন। ক্র্যাকারে ক্যাভিয়ার ছড়িয়ে মুখে তুলবার আগে প্রতিবার একটু হেসে নিচ্ছে সে। কথাবার্তা আর আচরণ এতই শান্ত আর বন্ধুভাবাপন্ন যে বিশ্বাস করা কঠিন এই লোক পাগলামির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।

লিমাজিনে চড়ে থিয়েটারের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রানাকে নিয়ে পড়ল কর্নেল হেজাজ।

দুই কর্নেলের মাঝখানে বসেছে রানা। বিরাট গাড়িটা সামরিক যানবাহনের মিছিলের সঙ্গে ছুটে চলেছে তেল আবিবের আরেক প্রান্তে। ওরা কোন আওয়াজ শোনেনি, তবে নিশ্চয়ই কোথাও

আত্মঘাতী বোমা ফাটিয়েছে ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধারা–সাইরেন বাজিয়ে এক ঝাঁক সামরিক অ্যাম্বুলেন্স ওভারটেক করল ওদেরকে, সেগুলোর পিছু নিয়ে ছুটছে ইজরায়েলি সৈন্য ভর্তি কয়েকটা ট্রাক।

'বলো দেখি, রানা,' হঠাৎ করে জানতে চাইল কর্নেল হেজাজ। 'ডক্টর ডেব্রাকে তুমি কেমন দেখলে?'

রানার হাত দুটো রয়েছে হাঁটুর উপর বিশ্রামের ভঙ্গিতে। সাইড উইন্ডো দিয়ে বাইরের ট্র্যাফিক দেখছে ও। 'ওর সঙ্গে আমি দেখা করিনি,' বলল রানা। 'ও ফোন করেছিল, কিন্তু আমি সময় দিতে পারিনি।' ঘাড় ফিরিয়ে কর্নেল হেজাজের দিকে তাকাল রানা।

কর্নেল হেজাজের ভুরু জোড়া বেঁকে ধনুক হয়ে গেল। 'ব্যাপারটা কেমন হলো, রানা? তুমি কী মেয়েমানুষের প্রয়োজন বোধ করছ না?' কৌতুকের ছিটেফোঁটাও নেই তার সুরে, যদিও হাসছে লোকটা।

জবাব দেওয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'এ-ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা কী শোভন হচ্ছে, কর্নেল হেজাজ?' হাসছে না ও।

'তোমাকে যে-কোন প্রশ্ন করা যায়, করলে অশোভন হবে না,' বলল মোসাদ কর্মকর্তা। 'অন্তত কই, এতদিন তো হয়নি। তা ছাড়া, প্রশ্ন না করলে জানব কীভাবে উলফ ডক্টররা আর কী কী ত্রুটি রেখে গেছে তোমার ভেতর।'

আবার সেই চমকে দেওয়ার মত ধাঁধা। উলফ বিজ্ঞানীরা ওর ডাবলের মধ্যে ত্রুটি রেখে গেছে...কীভাবে তা সম্ভব? ত্রুটি যে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই–ওর ডাবল কোন তথ্যই বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারত না। সেজন্য কি বিজ্ঞানী উলফরা দায়ী? এরকম আরও ত্রুটি ওর ডাবলের মধ্যে ছিল বা থাকতে পারত?

পরবর্তী অনিবার্য প্রশ্ন তা হলে: ওর ডাবল আসলে কী ছিল? মানুষ যদি না হয়...

উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে, সেটা ওকে সন্দেহের কারণ তৈরি করতে পারে। 'আপনি কে বলুন তো আমার ত্রুটি খুঁজে বের করার?' সাহস করে প্রশ্নটা করে বসল রানা। 'আপনি কি বিজ্ঞানী?' এটা এমন এক প্রসঙ্গ, মুখ খুললেও ভয়, না খুললেও ভয়। প্রতি মুহূর্তে ভুল করে বসবার আশঙ্কা। আর ভুল করলেই ধরা পড়ে যেতে হবে। 'আমার খুঁত আর ত্রুটি নিয়ে সিকিউরিটি চিফ হয়ে আপনি যদি মাথা ঘামান, ল্যাবের ওরা তা হলে কী করতে আছে?'

'কিন্তু ল্যাবের ওদেরকে তুমি তো এড়িয়ে যাচ্ছ। সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানের দায়িত্ব সিকিউরিটি চিফদের উপর এসে পড়ে না?' কর্নেল হেজাজ গম্ভীর হলো। 'ডক্টর ডেব্রা আমাকে ফোন করেছিলেন, রানা। তিনি তোমার ব্যাপারটা আমাকে তদন্ত করে দেখতে বলেছেন। তুমি না কি তাকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছ।'

'আমি ডেব্রা বা আপনার খুশিমত চলব, এটা আশা করাটা ভুল,' বলল রানা। 'দেশে ফেরার পর থেকেই লক্ষ করছি, আপনি জেরা করছেন আমাকে। ভাবটা যেন আমাকে আপনার কোন ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছে। আমি জানতে চাই, এর কারণ কী?'

কর্নেল হেজাজ কিছু বলবার আগে রানার কবজিটা ধরে মৃদু চাপ দিল কর্নেল জারকা, যেন কোন ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাইল।

কর্নেল হেজাজকে খানিকটা বিব্রত দেখাচ্ছে। গলা পরিষ্কার করল সে। 'মাই ডিয়ার রানা, আমি অবশ্যই তোমাকে জেরা করছি না। তোমার কিছু গোপন করার আছে, এ-ও আমি বিশ্বাস করি না। তবে যেহেতু তুমি ল্যাবে গিয়ে ওদেরকে সুযোগ দাওনি তোমাকে চেক করার, তাই ডেব্রা আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন তোমার ডিস্কটা চেয়ে নিয়ে একবার দেখি, ওটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা।'

'কেন?' রানা ভাবছে—সর্বনাশ। ডিস্কটা ওর বেলায় কাজ

করবে না।

'কারণ ডিস্কটা ডক্টর উলফরা কীভাবে বানিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, তাই ওটা কীভাবে কাজ করে সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে তোমার মত বাকি সাবজেক্টের শরীরে যন্ত্রপাতি বসানো হবে।'

মাথা ঠাণ্ডা রাখো, উত্তেজিত হয়ো না, ঘেমো না−নিজেকে কঠিন সব নির্দেশ দিচ্ছে রানা। 'কিন্তু আপনি দেখে কী করবেন? আপনি কি বিজ্ঞানী?'

'দেখতাম বোতাম তিনটে ঠিকমত কাজ করছে কি না। তারপর ডক্টর ডেব্রাকে জানাতাম।'

সেরেছে! রানার আত্মাটা খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম করল। লোকটা কি ওকে নিজেদের রানা নয় বলে সন্দেহ করছে?

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিতে হচ্ছে ডিস্কটা, এরকম একটা ভঙ্গি করে ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরল রানা। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ও। কী যেন ভাবল। তারপর কর্নেল হেজাজের চোখে চোখ রেখে হাসল। পকেট থেকে হাতটা বের করে মেলল ও। খালি। 'ওটা আনতে ভুলে গেছি, কর্নেল হেজাজ।'

'কেন, বেরুবার আগে ডায়েরিতে চোখ বুলাওনি? তা হলে তো আর ভুলতে না।'

চুপ করে থাকল রানা।

'শেষ কবে তুমি বোতামগুলো ব্যবহার করেছ?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল হেজাজ।

'আমি আপনাকে এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা। 'দেখা যাচ্ছে আপনার মধ্যে আমাকে মানুষ বলে গণ্য না করবার একটা প্রবণতা কাজ করে। বোধহয় সেজন্যেই আমাকে ইন্টারোগেট করছেন। কিন্তু এ আমি মানব না। কাল রিপোর্ট জমা দেয়ার সময় মহামান্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অবশ্যই আমি এ বিষয়ে অভিযোগ করব।'

কর্নেল হেজাজ জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল। 'কী আশ্চর্য,

রানা, কী করে তুমি ভাবতে পারলে আমি তোমাকে মানুষ বলে মনে করি না? বরং উল্টোটা সত্যি—তোমাকে আমি সুপারম্যান বলে মনে করি।'

'হতে পারে বুঝতে আমার ভুল হয়েছে,' গলা একটু খাদে নামিয়ে বলল রানা। 'আরও সময় নিয়ে দেখব আমি কোথায় কী ভুল করেছি।'

অস্বস্তিকর নীরবতার ভিতর ছুটে চলেছে গাড়ি। কর্নেল জারকা দু'বার আলাপ জমাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া গিলছে।

থিয়েটারের সামনে গাড়ি থেকে নামবার সময়ও আড়ষ্ট ভাবটা কাটল না। লোকজন ভিতরে ঢুকবার জন্য একাধিক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, সৈন্যরা সার্চ না করে কাউকে সামনে এগোতে দিচ্ছে না। নিজেদের আইডি দেখিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে নিল দুই কর্নেল, রানাকে নিজেদের মাঝখানে রেখেছে।

পুলিশ জায়গাটা কর্ডন করে রাখলেও, কর্ডনের বাইরে বেশ কিছু সাধারণ মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে—সম্ভবত বিখ্যাত নতর্কী শাকিলা মেহরুনকে এক পলক দেখতে পাবার আশায়।

থিয়েটারের লবি পুরোপুরি সবুজ—সবুজ কার্পেট, সবুজ দেয়াল, সবুজ সিলিং। শাখা-প্রশাখা নিয়ে ঝাড়বাতিটা সিলিঙের বিরাট একটা অংশ ঢেকে ফেলেছে। পথ দেখিয়ে ওদেরকে এলিভেটরে এনে তুলল কর্নেল জারকা। সরাসরি বক্স সিট-এ পৌঁছে যাবে ওরা। এমন কী এলিভেটরের ভিতরটাও সবুজ ভেলভেট দিয়ে মোড়া।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে কর্নেল হেজাজ 'এক্সকিউজ মি' বলে রেস্টরুমের দিকে চলে গেল। রানাকে নিয়ে পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে এগোল কর্নেল জারকা, নিজেদের বক্স খুঁজছে। হঠাৎ কাঁধ স্পর্শ করে রানাকে থামিয়ে দিল সে।

'সিট পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কর্নেল জারকার চেহারায় পরিষ্কার উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। 'রানা,' নিচু গলায় বলল সে। 'কথাটা নিশ্চয়ই রাগের মাথায় বলেছ? সত্যি নয়?'

'কোন্ কথাটা?'

'কর্নেল হেজাজ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করবে।'

'সারাক্ষণ কিছু না কিছু জানতে চাইছেন উনি। আমার সম্পর্কে তাঁর যদি কোন অভিযোগ বা সন্দেহ থাকে, রিপোর্ট করছেন না কেন?'

কর্নেলের হাসি দেখে মনে হলো কাকে যেন করুণা করছে। 'তোমাকে বুঝতে হবে যে আমার মত ইউনিভার্সিটির প্রোডাক্ট নয় সে। রেগুলার আর্মিতে কঠিন পরিশ্রম করে ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে। লোকটার অ্যামবিশন কোনও সীমারেখা বা যুক্তি মানে না। ওপরে ওঠার জন্যে এমন কোন কাজ নেই যা সে করবে না।

'তুমি যখন খুশি সরাসরি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে পারো, এটা ওর একদমই সহ্য হয় না। এই সুযোগটা নিজের জন্যে চায় সে। তোমার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মন বিষিয়ে তোলার সুযোগ পেলে, সেটা অবশ্যই ছাড়বে না।'

ওই একই হাসি ফিরিয়ে দিল রানা। 'ধন্যবাদ, কর্নেল জারকা। আপনি আসলে তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন আমাকে।'

'না, রানা, না। আমি আসলে বলতে চাইছি ব্যাপারটা তুমি আরেকবার বিবেচনা করে দেখো। ওর সঙ্গে তোমার লাগতে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

রানা চিন্তা করছে।

'ভাল কথা, তুমিই বা ল্যাবে একবার গেলে না কেন?' জানতে চাইল কর্নেল জারকা। 'এই প্রথম বিদেশ থেকে ঘুরে এলে, তোমার উচিত ছিল ওদেরকে একবার চেক করবার সুযোগ

দেয়া।’

‘সেই একই প্রশ্ন! উফ্! শেষ পর্যন্ত আপনিও? আমি সত্যি অসুস্থ বোধ করছি, কর্নেল জারকা।’

‘সেটা মেকানিকাল, না কি ফিজিকাল, জেনে নিলে ভাল করতে না?’ ওর কাঁধে একটা হাত রাখল কর্নেল জারকা। খেয়াল করল রানার চেহারা বদলে যাচ্ছে। ‘কাম ডাউন, ম্যান!’ হেসে উঠে পরিবেশটা হালকা করবার চেষ্টা করল। ‘শাকিলার নাচ শুরু হোক, দেখবে মন-মেজাজ কেমন ভাল হয়ে যায়।’

নিজেদের সিট খুঁজে নিয়ে বসল ওরা। ইতিমধ্যে কর্নেল হেজাজ ফিরে এসেছে। অর্কিস্ট্রা তাদের ইস্ট্রুমেন্ট টিউনিং শুরু করেছে। ওদের আশপাশের সিটগুলো ভরে যাচ্ছে। অর্কিস্ট্রায় কয়েকটা জনপ্রিয় আরবী আর হিব্রু গানের সুর বাজানো হলো। তারপর শুরু হলো নাচ।

মেকানিকাল? নকল রানা, ওর ডাবল, মেকানিকাল কারণে অসুস্থ বোধ করতে পারে?

পরদা ফাঁক হতে শুরু করায় দর্শকদের মধ্যে নীরবতা নেমে এল। অকস্মাৎ পরিপূর্ণ নীরবতা নয়, ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল গুঞ্জন; কয়েক মুহূর্ত বিচ্ছিন্ন দু'একটা কথা শোনা গেলেও, এক সময় থেমে গেল তাও।

পরদাটা যেন ফাঁক হতে অনন্তকাল সময় নিচ্ছে। আলো নিস্তেজ হলো, তারপর নিভে গেল। রানা অনুভব করল কর্নেল জারকা সিটের কিনারায় সরে এসেছে।

অডিয়েন্স যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। স্টেজে ছড়িয়ে থাকা নৃত্যশিল্পীদের উপর স্পট লাইট ছুটোছুটি করছে। কোমল সুর তুলল অর্কিস্ট্রা, সেই সঙ্গে কয়েকজন শিল্পী ধীর ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল বাকি শিল্পীরা। নাচে যখন মগ্ন সবাই, হঠাৎ করেই অর্কিস্ট্রার সুর বদলে গেল, সেই সঙ্গে স্থির মূর্তি হয়ে গেল শিল্পীরা, প্রত্যেকের হাত স্টেজের ডান

দিকে প্রসারিত।

ওদিক থেকে নাচতে নাচতে স্টেজে ঢুকল শাকিলা মেহরুন। অর্কিস্ট্রায় হালকা আনন্দ-উৎসবের সুর বাজছে। দর্শকদের সবাই যেন একযোগে নিঃশ্বাস ফেলল। প্রচণ্ড করতালিতে বিস্ফোরিত হলো অডিয়েন্স। এতই জোরাল সেটা, অর্কিস্ট্রার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না রানা।

এরইমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে কর্নেল জারকা। ওদের চারপাশে সবাই দাঁড়াচ্ছে। করতালির শব্দে মনে হলো কাঁপছে গোটা ভবন।

স্টেজে থেমে গেল নাচ। থেমে গেছে অর্কিস্ট্রা। শাকিলা মেহরুন প্রথমে ডান দিকে মাথা নোয়াল, তারপর বাম দিকে। ঠোঁটে হাসি লেগে আছে অল্প একটু। দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। কর্নেল জারকা ভয়ানক উত্তেজিত, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তালি দিচ্ছে সে। তার মত কর্নেল হেজাজ আর রানাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। একসময় ভয় লাগল, সত্যি না কানের পরদা ফেটে যায়। দর্শকরা থামছে না, ওদিকে শাকিলাও বারবার চারদিকে মাথা নোয়াচ্ছে।

তারপর হাততালি আর উল্লাসধ্বনি একটু কমল। ধীরে ধীরে আরও কমছে। এক সময় শুধু এদিক সেদিক দু'এক জায়গা থেকে শোনা গেল। তারপর নীরবতা। সেই নীরবতাকে সরিয়ে দিয়ে অর্কিস্ট্রায় বেজে উঠল হালকা সুর। আবার নাচ শুরু করল শাকিলা মেহরুন।

খসখস আওয়াজ তুলে দর্শকরা যে-যার সিটে বসল। হাতের তালু টকটকে লাল হয়ে উঠেছে কর্নেল জারকার। তার চোখে আশ্চর্য একটা দৃষ্টি দেখতে পেল রানা—কেমন যেন বুনো আর উদ্‌ভ্রান্ত। সেই দৃষ্টি আঠার মত আটকে থাকছে নৃত্যরতা শাকিলার উপর। পলক পড়া নেই, চোখের পাতায় নেই এতটুকু কম্পন। যেন শাকিলার সঙ্গে সে-ও ওই স্টেজে আছে।

আড়চোখে একবার কর্নেল হেজাজের দিকে তাকাল রানা।

বসবার পর থেকে চুপচাপ সে। চোখে-মুখে উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে আছে শাকিলার দিকে। এই লোক ওর চেনা শত্রু। পরিচিত শত্রুকে সামলাতে পারবে ও। প্রধানমন্ত্রীর ভয় দেখালেই কাজ হবে।

কিন্তু কর্নেল জারকাকে সামলানো অত সহজ হবে না। সে কখন কী অ্যাকশন নিতে যাচ্ছে, আগে থেকে তা বুঝবার কোন উপায় থাকবে না।

তবে শাকিলা সম্পর্কে তার অনুভূতি আর দুর্বলতার কথা জানে রানা। সামলাবার প্রয়োজন যখন দেখা দেবে, তখন হয়তো এই ব্যাপারটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে ও।

অবশেষে স্টেজ, অর্থাৎ শাকিলার নাচের দিকে মন দিল রানা। নিজের অজান্তে সবার মত ও-ও সিটের কিনারায় সরে এল। মঞ্চটা যেন নীল সরোবর, তাতে সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধবধবে সাদা একটা হাঁস—দুটোয় মিলে তৈরি হয়েছে একটা কাব্য; তরল একটা মূর্তি, ভেসে বেড়াচ্ছে এক ছন্দ থেকে আরেক ছন্দে। অর্কিস্ট্রার সুর আর ঝঙ্কার তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিখ্যাত 'অ্যারাবিয়ান নাইটস'-এ যে সংস্কৃতি, পরিচ্ছদ, সঙ্গীত আর নৃত্যচর্চার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এখানে সেই সবই পরিবেশিত হচ্ছে অতি দক্ষতার সঙ্গে। একসময় রানা উপলব্ধি করল, শাকিলা মেহরুনের অপূর্ব লীলায়িত নাচ ওকে ওর অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে।

ওরা স্টেজের খুব একটা কাছে বসেনি। ওদের বক্স ডানদিকে, প্রায় পাঁচ ফুট উপরে। পরিষ্কার টের পেল রানা, শাকিলা মেহরুনের রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দূরত্ব সত্ত্বেও আভা ছড়াচ্ছে সেই রূপ। সাজ-সজ্জা তার দেহসৌষ্ঠব গোপন করতে পারেনি।

বিরতির সময় পরদা জোড়া লাগছে, দর্শকরা আরেকবার উল্লাসে ফেটে পড়ল। পরদা সরিয়ে স্টেজের কিনারায় এসে

দাঁড়াল শাকিলা, দর্শকদের উদ্দেশে কখনও মাথা নোয়াচ্ছে, কখনও চুমো ছুঁড়ে দিচ্ছে। তারপর ঘুরে আবার ফিরে গেল পরদার আড়ালে। তারপরও অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকল করতালি।

এবারও সবার শেষে থামল কর্নেল জারকা।

থিয়েটারে ঢুকবার পর এই প্রথম মুখ খুলল কর্নেল হেজাজ। 'আমরা বোধহয় ধূমপান করতে চাই?'

কর্নেল জারকা আর রানা মাথা ঝাঁকাল। নিজেদের সিট ছেড়ে জনস্রোতের সঙ্গে এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে ওরা। লবিতে নেমে এসে দুই কর্নেলকে ইজরায়েলি চুরুট সাধল রানা।

চুরুটে আগুন ধরিয়ে সিলিঙের দিকে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল কর্নেল হেজাজ, তারপর বলল, 'তো, কর্নেল জারকা, শাকিলা মেহরুনের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে বলুন তো?'

'কেন, এ তো ওপেন সিক্রেট!' আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে উঠল ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর কর্মকর্তা। 'সবাই জানে, শাকিলাকে আমি বিয়ে করব।'

'সবাই জানে আপনি তার বাবার বন্ধু, তার আশ্রয়দাতা।'

'আপনি বোধহয় ইঙ্গিতে বয়সের পার্থক্যের কথাটা তুলতে চাইছেন।' এখনও হাসছে কর্নেল জারকা, দেখে সেটাকে কেউ সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক হাসি বলবে না। 'কিন্তু প্রেমের মাঝখানে বয়স কী কোনদিন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, বলুন?'

এবার সরাসরি আক্রমণ করল কর্নেল হেজাজ। 'শাকিলা জানেন আপনি তাকে ভালবাসেন?'

'না জানার কী আছে? নিশ্চয়ই সে বোকা নয়।'

'আপনি মুখ ফুটে কখনও তাঁকে কিছু বলেছেন?'

'তা বলিনি...বলা একটু কঠিনই...তবে সে বোঝে।'

'বোঝা যাচ্ছে একতরফা প্রেম,' জোর দিয়ে বললেন কর্নেল

হেজাজ। 'আর, সম্ভবত, আপনার মনোভাব টের পেয়েই আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে উঠে গেছেন তিনি।'

কর্নেল জারকার হাসি এতটুকু ম্লান হলো না। 'ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে সম্ভবত লোকনিন্দার ভয়ে–যাকে এখনও বিয়ে করেনি তার সঙ্গে একই বাড়িতে কী করে থাকে। অন্তত আমার তাই ধারণা।' তারপর হঠাৎ করে প্রসঙ্গ বদল করল সে। 'অনুষ্ঠানের পর আপনি গলা ভেজাবার জন্যে কোথাও থামবেন, না কি সোজা পার্টিতে যেতে চান?'

লবিতে ওরা একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়েছে, চারপাশে আরও বহু লোক ধূমপানের ফাঁকে কথা বলছে। 'ব্যাপারটা রানার ওপর ছেড়ে দেয়া যাক,' জবাব দিল কর্নেল হেজাজ। তার কণ্ঠস্বরে তেতো একটা ভাব আছে–নামটা উচ্চারণ করবার সময় বিশেষভাবে কানে বাজল।

কর্নেল জারকা রানার দিকে তাকাল। রানা জানতে চাইল, 'পার্টিতে মদ-টদ থাকবে না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। সব কিছু থাকবে।'

'তা হলে সরাসরি ওখানেই আমাদের যাওয়া উচিত।'

'গুড,' বলল কর্নেল জারকা। 'শাকিলার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা আলাপ আছে, পার্টি থেকেই নিয়ে যাব ওকে।'

লবির ঝাড়বাতি নিস্তেজ হলো, উজ্জ্বলতা ফিরে পেয়ে আবার হারাল। জলতরঙ্গের মত শব্দ তুলে একটা বেল বাজল। লোকজন হাতের সিগার আর সিগারেট ফেলবার জন্য জায়গা খুঁজছে। অনেকে এরইমধ্যে থিয়েটারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে।

'চলুন এগোই,' বলল কর্নেল জারকা। 'তা না হলে এলিভেটরের সামনে লাইন দিতে হবে।'

একটা ফুলদানির পশে অ্যাশট্রে পাওয়া গেল। দুই কর্নেল নিজেদের চুরুট নেভাচ্ছে, তাদের পিছনে অপেক্ষা করছে রানা। ওর পথ ছেড়ে দিয়ে পিছু হটল তারা।

শেষ একটা টান দিয়ে একটু ঝুঁকল রানা, অ্যাশট্রেতে ঘষে নিজের চুরুটটা নেভাল। তারপর যখন সিধে হচ্ছে, কাঁচ মোড়া দরজা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল বাইরে।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্যেও, পুলিশ কর্ডনের বাইরে, দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু লোক। রানার মনে হলো ভিড়টা যেন আগের চেয়ে একটু বড় হয়েছে। শাকিলা মেহরুন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী, তাকে দেখতে পাওয়ার আশায় এই লোকগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে, ভাবতে কেমন যেন লাগল রানার। মুখগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে ও।

অকস্মাৎ এত জোরে ঝাঁকি খেল রানা, ফুলদানির পাশ থেকে ছিটকে পড়ে গেল অ্যাশট্রেটা। বাইরে, ভিড়ের ভিতর কিছু একটা দেখেছে ও।

কর্নেল হেজাজ এরইমধ্যে এলিভেটরের দিকে রওনা হয়ে গেছে। একটু সরে এসে রানার কাঁধে হাত রাখল কর্নেল জারকা। 'কী ব্যাপার, রানা? তোমার মুখে রক্ত নেই কেন? কিছু হয়েছে?'

মাথা নাড়ল রানা, কর্নেলের সঙ্গে ঘুরে এলিভেটরের দিকে এগোল। কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। এলিভেটরে চড়বার পর খেয়াল করল কর্নেল জারকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে।

রানার মাথার ভিতর ঝড় উঠেছে। বাইরের ভিড়টায় পরিচিত একজনের মুখ দেখেছে ও। অতি পরিচিত।

হিংস্র এক মাসুদ রানার মুখ। ওর ডাবলের।

সাত

শাকিলা মেহরুনের নাচে যতই জাদু থাকুক, দ্বিতীয় পর্বটা বলতে গেলে রানা দেখলই না।

ওর শুধু মনে পড়ে যাচ্ছে নকল রানা সম্পর্কে কে কী বলেছে।

কর্নেল হেজাজই প্রথমে ওকে সাবধান করে দেয়, এয়ারপোর্টে–ওর দ্বারা ডেব্রার প্রেগন্যান্ট হওয়া চলবে না। ওদিকটা আনচার্টেড গ্রাউন্ড, এক্সপ্লোর বা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়নি।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কালো সিডানে চড়ে ওরা, কর্নেল হেজাজ জিজ্ঞেস করে–'তোমার স্মৃতিশক্তির কী অবস্থা?' রানা ভাল নয় বলবার পর সে মন্তব্য করে– 'তোমার দুর্বল স্মৃতিশক্তি বিরাট একটা সমস্যাই বটে। তবে চিন্তার কিছু নেই, এটারও সমাধান বেরিয়ে যাবে। ল্যাবে রাতদিন গবেষণা চলছে। কী জানো, এ হলো ডক্টর অটার আর ডক্টর বিয়েট্রিচ উলফের শয়তানি।'

এরপর টেলিফোনে শাকিলা মেহরুন বলল: 'আপনি অসামান্য, মিস্টার রানা। আপনি সত্যিকার অর্থে ইউনিক...ডক্টর অটার আর ডক্টর বিয়েট্রিচ উলফ বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন আপনি ঠিক কী ধরনের মানুষ।'

সবচেয়ে বেশি চমকে দেয় ডেব্রা আব্রাহাম, ওই টেলিফোনেই: '...জানোই তো, তোমাকে যারা মাসুদ রানা বানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম।'

পরে বলেছে: '...আমি জানি তুমি অতিমানব। আমি তোমাকে প্রায় সুপারম্যান বলে মনে করি...'

লিমাজিনে চড়ে থিয়েটারের উদ্দেশে আসবার সময় কর্নেল হেজাজ বলেছে: '...তোমাকে যে-কোন প্রশ্ন করা যায়, করলে অশোভন হবে না। তা ছাড়া, প্রশ্ন না করলে জানব কীভাবে উলফ ডক্টররা আর কী কী ত্রুটি রেখে গেছে তোমার ভেতর।'

এই সব কথাবার্তা থেকে কী বোঝা যায়? রানার ডাবল কি রোবট ছিল?

রানা যেন গভীর সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওর ডাবল রোবট যদি হয়েও থাকে, ধাতুর তৈরি ছিল না। রানা তাকে দেখেছে, তার কথা শুনেছে, তার সঙ্গে মারামারি করেছে–রক্ত-মাংসের হুবহু একজন মানুষই মনে হয়েছে ওর। তবে একটু মসৃণ বা পিচ্ছিল লেগেছিল লোকটাকে।

রক্ত-মাংসের তৈরি রোবট? নাহ্!

ক্লোন বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফসল?

কিন্তু রোবট হোক বা ক্লোন, রানা তাকে উত্তাল মাঝসাগরে ফেলে দেওয়ার পর বেঁচে আছে কীভাবে?

চোখের পলকে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এখন যদি ওর ডাবল কর্নেল হেজাজ বা কর্নেল জারকার সঙ্গে দেখা করে? ইজরায়েলের ভিতর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধরা পড়বার পরিণতি যে কী ভয়াবহ, কল্পনা করতেও শিউরে উঠল গা।

আড়চোখে দুই কর্নেলের দিকে একবার করে তাকাল রানা। একদৃষ্টে শাকিলার নাচ দেখছে তারা

কিন্তু তেল আবিবে ফিরে আসবার পর ওর ডাবল রিসার্চ ল্যাবে বা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কেন যায়নি? সঙ্গে নোটবুক নেই, তাই কী করতে হবে ভুলে গেছে? এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা যদি মনে না থাকে, কী করে মনে থাকল এই থিয়েটারে শাকিলা মেহরুন নাচবে, সেই নাচ দেখতে আসবে তার ইমিডিয়েট বস্ কর্নেল অরওয়েল জারকা আর কর্নেল মারকুইজ হেজাজ?

হঠাৎ অন্য একটা চিন্তা ঢুকল রানার মাথায়। ওর ডাবল সাধারণ লোকদের ভিড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কেন? একজন মিলিটারি গার্ডকে ডেকে বললেই তো পারে যে এটা একটা ইমার্জেন্সি, এই মুহূর্তে কর্নেল জারকা বা কর্নেল হেজাজের সঙ্গে

দেখা করতে চায় সে।

ওর ডাবলের কোন একটা সমস্যা আছে। আইডি ডিস্কটা সঙ্গে নেই, সেটাই কী সমস্যার কারণ?

তবে এখন থেকে সব কিছু দ্রুত ঘটবে। ওর ডাবল যদি কোন কারণে যোগাযোগ না-ও করে, দুই কর্নেল বা তাদের পরিচিত কারও না কারও চোখে পড়ে যাবেই সে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে, দুটো রানা কেন? যাচাই করা হবে কোন্‌টা আসল।

হাতে সময় নেই, আজ রাতের পার্টিতেই শাকিলা মেহরুনকে নিজের পরিচয় জানাতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। সে হয়তো ইতিমধ্যে জেনেছে মেরিন রিসার্চ ল্যাবে কী নিয়ে চলছে গোপন গবেষণা।

দর্শকরা সব দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রচণ্ড করতালিতে কানের পরদা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। এতক্ষণে দাঁড়াল রানা, দেখল স্টেজের পরদা জোড়া লেগে যাচ্ছে, নাচ শেষ করে সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছে শাকিলা।

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ভয়ে ভয়ে রাস্তার ওপারে তাকাল রানা। ভিড়টা আরও বড় হয়েছে। বারবার তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়েও নিজের মুখটা কোথাও দেখতে পেল না ও।

লিমাজিনটা ফুটপাতের পাশেই অপেক্ষা করছিল। ওরা উঠে বসতে গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। হাঁফ ছাড়ল রানা।

'রানা,' আবেগে আর উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল জারকা। 'বলো, শাকিলার নাচ কেমন দেখলে? কী বলো তুমি, জাদু নয়? প্রায় অলৌকিক নয়?'

'এত ভাল নাচ সত্যি আমি আগে কখনও দেখিনি।'

'তুমি আসলে কোন নাচই এর আগে দেখোনি,' রানার বাম পাশ থেকে কঠিন সুরে শুধরে দিল কর্নেল হেজাজ। 'তাই ভাল-খারাপ বোঝার প্রশ্নই ওঠে না।'

শহরের কোথাও একটা বোমা ফাটল। পরমুহূর্তে ব্রাশ

ফায়ারের আওয়াজ ভেসে এল।

'আমি জানি, এর আগে কোন নাচ আমার দেখার সুযোগ হয়নি,' বলল রানা, ঝাল ঝাড়বার ভঙ্গিতে চিবিয়ে চিবিয়ে। 'ওটা একটা কথার কথা বলেছি।'

ওরা দু'জন কী বলছে না বলছে সেদিকে খেয়ালই নেই কর্নেল জারকার। গ্রাহ্য করছে না গোলাগুলির শব্দকেও। সে বলে চলেছে, 'সবুর করো। আগে শাকিলাকে জানবার সুযোগ হোক তোমার। তখন বুঝবে ঈশ্বর বেহেশতের সমস্ত সুধা আর মাধুর্য দিয়ে তৈরি করেছে ওকে।'

সামরিক বাহিনীর একজন বড় অফিসার এরকম শিশুসুলভ আবেগে ভেসে যাবে, ভাবা যায় না। অথচ ঠিক তাই ঘটছে।

পার্টির আয়োজন করেছে শাকিলা মেহরুনের কিছু ভক্ত। সবাই তারা তেল আবিবের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। এই উপলক্ষে তেল আবিবের অত্যন্ত নামজাদা একটা রেস্তোরাঁর পুরোটাই এক বেলার জন্য ভাড়া করা হয়েছে।

শহরের প্রতিটি রাস্তাতেই সশস্ত্র সৈনিকরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তারপরও পার্টি উপলক্ষে রেস্তোরাঁটার চারপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরোহী হিসাবে দু'জন কর্নেল থাকায় রোডব্লকগুলোয় ওদের গাড়িতে তল্লাশী চালানো হয়নি। রেস্তোরাঁর সামনে নেমেও কোন ঝামেলা পোহাতে হলো না। প্রথমে নামল কর্নেল জারকা, তার ঠিক পিছনে রয়েছে রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দূরের ভিড়টার উপর দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে ও। থিয়েটারের সামনে যখন ছিল, এখানেও থাকতে পারে ওর ডাবল। তবে না, ভিড়ের মধ্যে কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। ডোরম্যান পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ওদেরকে, তারপর দরজা খুলে দিল।

ভিতরে অতিথিদের আসর গমগম করছে। লোকজন টেবিলে বসে আছে, আবার অনেকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

সবাই হাসিখুশি, প্রায় প্রত্যেকের হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস।

'এদিকে,' বলল কর্নেল জারকা। রানা আর কর্নেল হেজাজ তার পিছু নিয়ে যে টেবিলটার সামনে এসে থামল, সেটা যেন রেস্তোরাঁর পুরো দৈর্ঘ্য দখল করে রেখেছে। সম্ভাব্য সব রকম স্ন্যাকস আর পানীয় সাজানো রয়েছে তাতে। ওদের চারপাশে লোকজন কথা বলছে নিচু স্বরে, আর প্রসঙ্গ বলতে গেলে একটাই–শাকিলা মেহরুন।

ডিনার সেরেই এসেছে ওরা, নিজ নিজ গ্লাসে খানিকটা করে পানীয় নিল তিনজন। রানা নিল হুইস্কি-সোডা, বাকি দু'জন নিল শ্যাম্পেন। তারপর একসময় কীভাবে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ওরা।

ভিড়ের মধ্যে, খানিক দূরে কর্নেল হেজাজকে দেখতে পেল রানা, এক কোণে দাঁড়িয়ে চারজন ষণ্ডামার্কা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকগুলোকে সিকিউরিটি গার্ড বলে মনে হলো ওর।

রেস্তোরাঁয় ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল জারকা, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বাইরেটা দেখছে। একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে মাঝে মধ্যে ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে রানা। সবাই ওরা শাকিলা মেহরুনের জন্য অপেক্ষা করছে।

রানার গ্লাস অর্ধেকটা খালি হয়েছে, এই সময় উত্তেজনার একটা ঢেউ বয়ে গেল রেস্তোরাঁর ভিতর, ধান খেতে জোরাল একটা বাতাসের মত। কাউকে বলে দিতে হলো না যে শাকিলা মেহরুন পৌঁছেছে।

সৈনিক আর সিকিউরিটি গার্ডরা বাইরে লোকজনের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। নিজের জায়গা থেকে ডাবল এজেন্ট মেয়েটিকে এখনও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে না রানা। তবে দেখল উন্মাদের মত দুই হাত নাড়ছে কর্নেল জারকা। লোকজনের একটা স্রোত প্রবেশপথের দিকে এগোচ্ছে। রানাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে তারা। গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ও, জানে কর্নেল

জারকা শিল্পীকে ওর কাছে নিয়ে আসবে।

সম্ভবত অতিথিরাই বাইরের ভিড় থেকে শাকিলাকে উদ্ধার করে ভিতরে নিয়ে এল। ভাল করে তাকাতে ভুলটা ভাঙল রানার। অতিথিরা নয়, কৃতিত্বটা চার ষণ্ডামার্কা সিকিউরিটি গার্ডের–খানিক আগে যাদেরকে কর্নেল হেজাজের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে ও। শাকিলাকে রেস্তোরাঁর ভিতর নিয়ে আসবার পর মারমুখো হয়ে আবার তারা বেরিয়ে গেল বাইরে, সম্ভবত ভিড়টাকে ভাঙবার জন্য।

এবার রেস্তোরাঁর অতিথিরা ঘিরে ধরল শাকিলাকে। এখনও তাকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না রানা। পাশে কর্নেল জারকাকে দেখা যাচ্ছে, এক হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে সরু কোমরটা। সবার উদ্দেশে সগর্বে হাসছে সে। মাঝে-মধ্যে মেয়েটির কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় কিছু বলছে। জারকার অপর হাতটা গাইড করছে তাকে, ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ তৈরি করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে রানার দিকে।

শাকিলার মাথায় প্রচুর চুল। নাচের সময় মাথায় স্তূপ করা ছিল। স্টেজে দেখে বোঝা যায়নি, কাঠামোটা ছোটখাট। তার গোটা শরীর অনেকগুলো বৃত্তাকার অঙ্গের সমষ্টি। মুখটা তো গোলই, সেই সঙ্গে কালো চোখ, চিবুক, ঠোঁটসহ সামনের অংশটা, সবই গোল। নাচের সময় ছিল, এখন মেকআপ নেই। চেহারায় ফুটে আছে তাজা ফুলের সজীবতা।

সেই আগের হাসিটাই ধরে রেখেছে মুখে। রানা ধারণা করল, ওই হাসি শুধু ভিড় আর দর্শকদের জন্য আলাদা করা। মাঝে মধ্যে কর্নেল জারকার দিকে তাকাচ্ছে সে–তখন তার দৃষ্টিতে না থাকছে ভক্তি বা ভালবাসা, না কোনও রকম শ্রদ্ধাবোধ। তার ভক্তরা যে হাসি আর দৃষ্টি উপহার পাচ্ছে, কর্নেল জারকাও ঠিক তাই পাচ্ছে, অতিরিক্ত কিছু নয়। পরিষ্কার বোঝা যায়, বিয়ে করবার ইচ্ছেটা কর্নেল জারকার এক তরফা।

শাকিলাকে নিয়ে রানার দিকে রওনা হয়েছে সে। অতিথিরা এখনও চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে শাকিলাকে, অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তারা যখন রেস্তোরাঁর অর্ধেকটা পার হয়ে এসেছে, চারজন ষণ্ডামার্কা সিকিউরিটি গার্ডকে ফিরে এসে শাকিলার দু'পাশে পজিশন নিতে দেখল রানা। অতিথিদের তারা বলছে, শিল্পী তাদের সঙ্গে পরে কথা বলবেন, এখন তাঁর পথ ছেড়ে দেওয়া হোক।

ফাঁক হয়ে গেল অতিথিদের ভিড়। হঠাৎ করে কর্নেল জারকা আর শাকিলা মেহরুনকে রানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ওর দিকেও সেই একই দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটি, হাসলও সেই একই হাসি।

'রানা!' কর্নেল জারকা ভারী উত্তেজিত। 'সোজা তোমার কাছে নিয়ে এলাম ওকে।' তার একটা হাত এখনও শাকিলার সরু কোমরটা জড়িয়ে রেখেছে, গাইড করবার ভঙ্গিতে। 'শাকিলা, ডার্লিং, চিনতে পারো–মাসুদ রানা–তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম...'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিজের হাতটা রানাকে ধরতে দিল শাকিলা, ঠোঁটের হাসি আরও চওড়া হলো, তবে কাঁপা কাঁপা। হাতটা অনেকক্ষণ ধরে রাখল রানা। স্টেজে মেয়েটির রূপ আর নৈপুণ্য দেখে শতকরা দশ ভাগও আন্দাজ করা যাবে না কাছ থেকে সে কেমন দেখতে।

'তোমার নাচ আমার ভাল লেগেছে,' বলল রানা।

আশ্চর্য এক কৌতূহলী দৃষ্টিতে রানাকে দেখছে মেয়েটি। রানার দৃষ্টিতে ব্যাপারটা অবশ্য স্বাভাবিকই মনে হলো। শাকিলা জানে তার সামনে নকল একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। নকল মানুষ? না কি ক্লোনমানব? 'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা,' বলল শাকিলা। 'আপনি বিদেশ থেকে ফিরে আসায় আমরা সবাই খুশি হয়েছি।'

রানা বুঝল, ওকে ফোন করবার ব্যাপারটা যে-কারণেই হোক চেপে রাখতে চাইছে শাকিলা। কর্নেল জারকার দিকে তাকাল ও। ‘কী ব্যাপার, কর্নেল, দেখছেন না শাকিলার হাতে ড্রিঙ্ক নেই? অতক্ষণ নাচার পর নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে ওর।’

‘ও! হ্যাঁ, তাই তো।’ ব্যস্ত হয়ে উঠল কর্নেল জারকা। ‘ঠিক আছে, দেখছি...’ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ভিড়ের ভিতর ঢুকে হারিয়ে গেল সে।

শাকিলার কাঁধের উপর দিয়ে আশপাশের মুখগুলোর উপর চোখ বুলাল রানা। বেশির ভাগ লোকই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, তবে তারমানে এই নয় যে শাকিলাকে কেউ তারা এড়িয়ে যাচ্ছে। খানিক পরপরই ওর দিকে তাকাচ্ছে তারা, খেয়াল রাখছে রানার সঙ্গ কখন ত্যাগ করবে। স্মিত হাসিটা এখনও লেগে আছে শাকিলার ঠোঁটে।

কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে এনে রানা বলল, ‘শাকিলা, আমি আসল মাসুদ রানা, বাংলাদেশ থেকে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।’

চোখ পিটপিট করল শাকিলা। মুখের হাসি ম্লান হলো খানিকটা। যে দৃষ্টিতে তাকাল, বলা যায় মৃদু আগ্রহ বোধ করছে, তার বেশি কিছু নয়। কালো চোখ দিয়ে রানার যেন প্রতিটি রোমকূপে তল্লাশী চালাচ্ছে। ‘মাফ করবেন, কী যেন বললেন?’

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা কেউ ওর কথা কান পেতে শুনছে না। ‘আমি সোহেল আহমেদের বন্ধু,’ বলল ও। ‘আমাকে বিসিআই থেকে পাঠানো হয়েছে। আমি তোমাকে ইজরায়েল থেকে বের করে নিয়ে যাব বলে এসেছি।’

শাকিলা পিছন দিকে হেলান দিতে চাইল বা হয়তো টলে উঠল। ওর অবস্থাটা রানা বুঝতে পারছে। যদি স্বীকার করে রানা কেন এসেছে তা সে জানে, তা হলে সেটা নিজেকে ডাবল এজেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়ে যায়। রানা যদি ছদ্মবেশী মোসাদ

অপারেটর, বা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট, অর্থাৎ ওর ডাবল হয়, তা হলে শাকিলার জীবনের এক কানাকড়ি মূল্যও থাকে না। এই কামরা ছেড়ে তার আর প্রাণ নিয়ে বেরুনো হবে না। এ-ধরনের স্বীকারোক্তি কেউ কখনও করে না।

'দুঃখিত, আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না,' বলল শাকিলা। লো-কাট গাউনের ভিতর তার সুগঠিত স্তন জোড়া দ্রুত উঁচু-নিচু হলো।

'ওই লোকটা নকল মাসুদ রানা ছিল, এর আগে যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে,' বলল রানা। 'সে সম্ভবত আমার ক্লোন। তাকে দু'বার খুন করা হয়েছে, অথচ তারপরও কীভাবে জানি না তেল আবিবে ফিরে এসেছে সে...থিয়েটারের বাইরে তাকে আমি দেখেছি...

'যাই হোক, আমার ওই ডাবল যে-কোন মুহূর্তে সব ভণ্ডুল করে দেবে। কাজেই আমাদের হাতে একদমই সময় নেই। কথা ছিল মেরিন রিসার্চ ল্যাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে তুমি—করেছ?'

'আ...আমি স-সত্যি জানি না আ-আপনি কী ব-বলছেন।'

রানা দেখল লম্বা টেবিলটা থেকে ফিরে আসছে কর্নেল জারকা, দু'হাতে দুটো গ্লাস নিয়ে। 'শাকিলা, জারকা ফিরে আসছে। এরপর আর তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব না। শোনো, তুমি বিসিআই-এর একজন এজেন্ট। তোমার নামে একটা সুইস ব্যাঙ্কে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার জমা রাখা হয়েছে। শর্ত ছিল তিন বছর কাজ করার পর বিসিআই তোমাকে ইজরায়েল থেকে বের করে নিয়ে যাবে। তবে তার আগে অবশ্যই মেরিন রিসার্চ ল্যাবে কী হচ্ছে জানতে হবে আমাদেরকে। তুমি কিছু জানতে পেরেছ?'

হাত বাড়িয়ে রানার কবজিতে আঙুল ছোঁয়াল শাকিলা। তার চোখে ভয়। কর্নেল জারকা কাছে চলে আসছে, ওর কাঁধের উপর

দিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে দেখছে রানা। 'ভাল হত যদি...'

শুরু করলেও, শেষ করল না শাকিলা। রানা বলল, 'আর যদি বিশ সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে না পারো, সুযোগটা হারাবে তুমি। সেক্ষেত্রে যা করার একাই করতে হবে আমাকে, আমি ফিরেও যাব একা। তোমার পিছন দিক থেকে জারকা চলে আসছে। বলো, কোথায় আমাদের দেখা হবে?'

মাথা নোয়াল শাকিলা। চুলে ঢাকা পড়ে গেল মুখ। তারপর ঝট করে মুখ তুলল। চেহারা দেখে মনে হলো, একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছে। 'আমার ফ্ল্যাটে,' বিড়বিড় করে বলল। 'জানেন নিশ্চয় যে পার্টির পর আংকেল আমাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছেন?'

'আংকেল?' রানা দেখল হাতের গ্লাস একটা টেবিলে রেখে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে কর্নেল জারকা।

'কর্নেল জারকা,' বলল শাকিলা। 'উনি অবশ্য নাম ধরতে বলেন। আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

'হ্যাঁ, জানি। তা হলে...জারকা তোমাকে ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে আনার পর?'

'ঠিক আছে। আজ রাতে আমি হয়তো আরও কিছু তথ্য জানতে পারব। দেখি ল্যাবে যেতে চাইলে নিয়ে যায় কি না।' ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা জানাল শাকিলা।

'রিসার্চ ল্যাবের একটা ম্যাপ খুব দরকার আমার...কোথায়, কীভাবে যেতে হয়...'

'এই নাও,' বলে ওদের মাঝখানে ঢুকে পড়ল কর্নেল জারকা, শাকিলার হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল। 'কী ব্যাপার, শাকিলা?' হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল সে। 'তোমাকে এরকম নার্ভাস লাগছে কেন?' সন্দেহ ভরা দৃষ্টি রানার মুখ থেকেও একবার ঘুরে এল।

মাথা নাড়ল শাকিলা। একটু বেশি জোরে হয়ে গেল। ‘কই, না! কেন নার্ভাস লাগবে?’ মুখে যাই বলুক, হাসিটা একটু আড়ষ্ট দেখাল। রানার দিকে তাকাল ও। ‘আপনার সঙ্গে কথা বলে সত্যি খুব ভাল লাগল, মিস্টার রানা।’

‘এ ভাল লাগা আমারও,’ বলে কর্নেল জারকার দিকে তাকাল রানা। ‘আপনার কথাই ঠিক, সার। এখানে আমরা সমস্ত স্বর্গীয় সুধা আর মাধুর্য দিয়ে তৈরি ঈশ্বরের একটা অনুপম শিল্পকর্ম দেখতে পাচ্ছি।’

কর্নেল জারকার একটা হাত ধরল শাকিলা। ‘আংকেল, চলুন, সবার সঙ্গে কথা বলি?’

‘তোমাকে না বলেছি, আমাকে আংকেল বলবে না!’ চাপা স্বরে গর্জে উঠল কর্নেল জারকা। চোখের পলকে কদাকার, বীভৎস আর হিংস্র হয়ে উঠল তার চেহারা।

তাদেরকে হেঁটে যেতে দেখছে রানা। শাকিলা সন্ত্রস্ত, ভয়ে কাঁপছে। কর্নেল রাগ দমন করবার জন্য চোখ নামিয়ে জুতোর ডগার দিকে তাকিয়ে আছে।

আট

‘ওর আচরণ আমার ভাল ঠেকছে না,’ কর্নেল মারকুইজ হেজাজ বলল। ভক্ত অতিথিদের সঙ্গে গল্প করছে শাকিলা, এই সুযোগে তার পাশ থেকে কর্নেল অরওয়েল জারকাকে নিভৃত এক কোণে ডেকে এনেছে সে। ‘এ রানা যেন সেই রানা নয়।’

‘মানে?’

‘ডিস্কটা দেখতে চাইলাম, দেখাল না, বলল নিয়ে আসতে ভুলে গেছে। মিথ্যে কথা!’

‘কী করে বুঝলেন?’

‘ওর হোটেল স্যুইটে লোক পাঠিয়েছিলাম। তন্নতন্ন করে সার্চ করেও ডিস্কটা পায়নি তারা।’

‘তাতে কিছু প্রমাণিত হয় না,’ কর্নেল জারকা বলল। ‘ওটা হয়তো ওর পকেটেই আছে, আপনাকে দেখাতে চায়নি। এরকম ঘাড়-তেড়ামি করতে পারে ও, সেভাবেই ওকে তৈরি করা হয়েছে–আসলটার সঙ্গে মিল রেখে।’

‘আমি আসলে আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না,’ বলল কর্নেল হেজাজ, কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণু ভাব। ‘শুধু তো এই একটা ব্যাপার নয়। খেয়াল করেছেন, ওর সঙ্গে কোন ডায়েরি নেই?’

স্থির হয়ে গেল কর্নেল জারকা। ‘হুঁ। আর কী?’

‘তেল আবিবে এসেছে দশ ঘণ্টা হতে চলল, অথচ এখনও একবার ল্যাবে যায়নি। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মিস ডেব্রার সঙ্গে দেখা করেনি ও!’

কর্নেল জারকা গম্ভীর। চিন্তা করছে। ‘তা হলে বলি আপনাকে। আমারও একটু সন্দেহ হচ্ছে। কী যেন একটা শাকিলাকে বলেছে রানা, সেই থেকে আড়ষ্ট হয়ে আছে সে।’

‘চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। ব্যাপারটা আমার মোটেও ভাল লাগছে না।’

‘আচ্ছা, আপনি ঠিক কী সন্দেহ করছেন বলুন তো?’

‘বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে...এ কি আমাদের লোক?’ জিজ্ঞেস করল কর্নেল হেজাজ। ‘উলফদের তৈরি ক্লোন অ্যান্ড মেকানিকাল সাবজেক্ট? না কি ও আসলে...আসল মাসুদ রানা?’

‘হায়, মুসা! এ আপনি কী বলছেন?’ চমকে উঠল কর্নেল জারকা।

বিশ মিনিট পর হঠাৎ করে রানার পাশে হাজির হলো কর্নেল হেজাজ, থাকল পার্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। শাকিলার সঙ্গে আর কোন কথা বলবার সুযোগ রানা পেল না। ভক্তদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটা, আলাপ করছে, পাশে সারাক্ষণ আঠার মত সেঁটে আছে কর্নেল জারকা।

রানার চোখে দু'বার ধরা পড়ল, শাকিলার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছে কর্নেল জারকা, মাথা সরিয়ে নিয়ে তাকে নিরুৎসাহিত করল শাকিলা। তিনবার রানার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হলো। শাকিলাই প্রথমে সরিয়ে নিল দৃষ্টি, মেক-আপবিহীন গালদুটো লালচে হয়ে ওঠাটা রানার চোখে ঠিকই ধরা পড়ে গেল।

পার্টি শেষ হতে কর্নেল জারকার সঙ্গে ওকে চলে যেতে দেখল রানা, ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল হেজাজ।

'রাত তো কম হলো না, রানা,' বলল সে। 'লিমাজিনটা আনতে বলি?'

শহর তো নয়, যেন যুদ্ধক্ষেত্র। খানিক পর পর রোডব্লক, প্রতিটি রোডব্লকে ট্যাংক দাঁড়িয়ে আছে, বালির বস্তার আড়ালে ফিট করা হয়েছে মেশিন গান। এত কড়া পাহারা সত্ত্বেও খানিক পরপরই শহরের এদিক-সেদিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে।

'আচ্ছা, রানা, রিপোর্ট জমা দিতে কাল তুমি কখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যাচ্ছ বলো তো?' হঠাৎ জানতে চাইল কর্নেল হেজাজ, রানার সঙ্গে ব্যাকসিটে বসেছে সে।

'কেন জানতে চাইছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, কণ্ঠস্বরে রসকষ বলে কিছু নেই।

'না, ডেব্রা বলছিল, কাল ল্যাবে তোমাকে ওদের দরকার হবে,' বলল কর্নেল হেজাজ।

'আমি বোধহয় বিকেলের দিকে যেতে পারব,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, ডক্টর ডেব্রাকে আমি মেসেজটা জানিয়ে দেব। ধন্যবাদ। ড্রাইভার, মিস্টার রানাকে পামবিচ ইন্টারন্যাশন্যালে নামিয়ে দাও।'

হোটেলের টপ ফ্লোরে উঠে এসে করিডর ধরে হাঁটছে রানা। পকেট থেকে চাবি বের করে স্যুইটের সামনে থামল। দরজা খোলেনি, তার আগেই আলো দেখে বুঝতে পারল স্যুইটে কেউ ঢুকেছে। দরজার নীচের ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে।

করিডরে কেউ নেই। হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করল রানা। তালা খুলে দরজার কবাটে ধাক্কা দিল, তারপর উঁকি দিয়ে স্যুইটের ভিতরে তাকাল।

সিটিংরুমে নেই কেউ। সাবধানে ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল, সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে বেডরুমের দিকে। বেডরুমেও আলো জ্বলছে। নিচু স্বরে কথা বলছে কে যেন। পুরুষের মত গমগমে হলেও, নারীকণ্ঠ।

কার্পেটের উপর দিয়ে সাবধানে এগোল রানা। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাতে বিছানাটা দেখতে পেল। ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথে চলে আসছে একজোড়া ফর্সা পা। একজন শ্বেতাঙ্গিনী ওর বিছানায় শুয়ে আছে। পা, তারপর ঊরু দেখে মনে হলো মেয়েটা আকারে বেশ বড়সড়।

হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে বেডরুমের দরজার সামনে দাঁড়াল রানা। শুয়ে ছিল, ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল মেয়েটি, কান থেকে সরিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা ধীরে ধীরে ক্রেডলে রেখে দিচ্ছে। ভরাট স্বাস্থ্য। রানাকে দেখামাত্র আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, পুরুষালিই বলতে হয়, চেহারাটা।

'হাউ ডু ইউ ডু,' বলল রানা।

'ডার্লিং!' কয়েক গোছা সোনালি চুল তার চোখে পড়েছে। বিছানার চাদরটার একটা প্রান্ত গলার কাছে ধরে রেখেছে, শরীরটা আড়াল করবার ভঙ্গিতে। হাসিটা চওড়া হলো। 'আমার তর সইল

না,’ বলল সে। চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে।

কাঠামোটা সত্যি বড়সড়। বোঝা গেল সহজেই। তার পরনে একটা সুতোও নেই।

পরমুহূর্তে একটা ঝড় উঠল কামরার ভিতর।

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখছে রানা, বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল ডক্টর ডেব্রা আব্রাহাম, অপর হাতে ওর কাপড়চোপড় ধরে টানছে। তাকে ঠেকাতে গিয়ে সুবিধে করতে পারছে না রানা।

ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে বিছানার উপর ফেলে দিল ডেব্রা, তারপর ডাইভ দিয়ে পড়ল ওর বুকে। ‘আমার এই শরীরটাকে তুমি উপোস করিয়ে রেখেছ,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। ‘যে আনন্দের সন্ধান তুমি দিয়েছ, তারপর কী করে এটা উপোস থাকে, বলো?’ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা ওকে। রানার সুট খুলে ফেলল। শার্টের বোতাম ছিঁড়ল। হোলস্টারে হাত দিতে যাবে, শরীরটা গড়িয়ে সরে এল রানা। ‘কী করছ তুমি?’ হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিজের নাগালের মধ্যে নিচু টেবিলে রাখল, ডেব্রার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে। তারপর বগলের নীচের ছুরিটাও। ‘সব কাজের জন্যেই একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার!’

রানা কথা শেষ করতে পারল না, আবার ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডেব্রা।

একে সুন্দরী, তার উপর শরীরে উথলানো যৌবন, বলা কঠিন নিজেকে রানা কতক্ষণ সামলে রাখতে পারবে।

ঝড় থেমে যাওয়ার পর বালিশে মাথা রাখল ওরা, পরস্পরের পাশে শুয়ে আছে। রানা ক্লান্ত, তবে তৃপ্ত। প্রথম দিকে মেয়েটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল, বলাই বাহুল্য যে সফল হতে পারেনি। ওর ভয় ছিল দৈহিক সম্পর্ক হলে ডেব্রা ধরে ফেলবে, নকল নয়

ও। তখন ডেব্রাকে খুন না করে উপায় থাকবে না ওর। আর তেল আবিবের মত জায়গায় একটা লাশ গুম করা এক কথায় অসম্ভব। শুধু তো লাশ গুম করা নয়, আরও একশো একটা জটিলতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু সাবধান হয়েও মেয়েটার হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি ও। শেষ দিকে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে ফিসফিস করে জানতে চাইল মেয়েটা, 'কে তুমি?'

'বোঝা গেছে আমি নকল মাসুদ রানা নই?'

'খুব বেশিই বোঝা গেছে,' বলল ডেব্রা, রানার মুখটা খুঁটিয়ে দেখছে। 'আচ্ছা, তুমি তা হলে আসল মাসুদ রানা! তোমার জিন থেকেই ক্লোন সিস্টেমের সাহায্যে ওটাকে বানিয়েছি আমরা–হুবহু তোমারই আরেকটা সংস্করণ,' স্বগতোক্তির সুরে বলল সে। 'আশ্চর্য, এই নরকে তুমি কোন্ সাহসে ঢুকেছ? ঢুকলেই বা কীভাবে?'

'কী বানিয়েছ তোমরা জানো,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্য যে ভাল নয়, এ-কথা আশা করি তোমরা নিজেরাও স্বীকার করবে। এরই মধ্যে ওই ডাবল কয়েকটা দেশের মারাত্মক ক্ষতি করেছে।'

'তোমার এই ঘরে মাইক্রোফোন নেই তো?' হঠাৎ জানতে চাইল ডেব্রা, একটু সন্ত্রস্ত বা বিচলিত দেখাল তাকে।

'শেষবার পরীক্ষা করার সময় ছিল না,' বলল রানা।

'আমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে আছি। ওদের লোক এসে একবার সার্চ করে গেছে। শুধুই সার্চ করতে দেখলাম, তারমানে আড়িপাতার কোন যন্ত্র নেই।'

'ওরা কারা? কী খুঁজতে এসেছিল? চাবি পেল কোথায়? তুমিই বা কীভাবে ঢুকলে এখানে?'

'ওরা মোসাদ এজেন্ট, ওদের আবার চাবি পেতে হয় না কি? তোমার ডিস্কটা খুঁজছিল ওরা। ওদের আগে ঢুকেছি আমি, তবে

ওদের কাছ থেকে চাবি নিয়েই ।’

‘মাইক্রোফোনের কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?’

‘তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলার জন্যে ।’ চাদরের তলা থেকে হাত বের করে রানার বুকে রাখল ডেব্রা । ‘তোমার সঙ্গে আমি একমত, বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত এসপিওনাজ এজেন্টদের জিন ব্যবহার করে তাদের নকল তৈরি করার পেছনে ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের উদ্দেশ্য আসলেই ভাল নয় । এটা একটা অমানবিক প্রজেক্ট । ওদের একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র...’

‘সেই ষড়যন্ত্রে তুমি তা হলে ওদেরকে সাহায্য করছ কেন?’

বিছানার উপর উঠে বসল ডেব্রা, চাদরটা গলার কাছে ধরে আছে । ‘সাহায্য করছি প্রাণের দায়ে, রানা । আমার ওপর অত্যাচার হচ্ছে । আমি খ্রিস্টান, ওদের কথামত কাজ না করলে স্রেফ মেরে ফেলবে । ডক্টর অটার উলফ আর তার স্ত্রী ডক্টর বিয়েট্রিচ উলফ যখন তোমার ডাবল অর্থাৎ ক্লোন অ্যান্ড মেকানিকাল সাবজেক্ট তৈরি করল, তার প্রতিটি কাজ খুঁটিয়ে রেকর্ড করার জন্যে একদল ইজরায়েলি বিজ্ঞানীকে দায়িত্ব দেয়া হয়, ওই গ্রুপে আমিই ছিলাম একমাত্র খ্রিস্টান ।’

‘ওরা কারা? ডক্টর অটার আর ডক্টর বিয়েট্রিচ উলফ?’

‘দুই জার্মান বিজ্ঞানী । দু’জনেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর পিএইচডি । ওদের কোন সন্তান হয়নি, হোতও না । তাই স্বামী-স্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন ক্লোনিং-এর মাধ্যমে নিজেদের মত দেখতে একটা ছেলে বা মেয়ের জন্ম দেবেন । এ বিষয়ে বার্লিনের একটা সায়েন্স ম্যাগাজিনে কয়েকটা প্রবন্ধও লেখেন তাঁরা । সে সব প্রবন্ধে বলা হয়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের এমন একটা পদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে মাত্র কয়েক মাসে পূর্ণ বয়স্ক ক্লোন মানব তৈরি করা সম্ভব, সম্ভব তার খুলির ভিতর কমপিউটারইজড মেকানিকাল ব্রেন প্রতিস্থাপন করা ।’

‘তারপর?’

‘সংক্ষেপে সারি, কেমন? তারপর ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স তাঁদেরকে বার্লিন থেকে কীভাবে যেন কিডন্যাপ করে তেল আবিবে নিয়ে আসে। বন্দি ডক্টরদের তোমার জিন দিয়ে বলা হয়, তিন মাসের মধ্যে আরেকটা মাসুদ রানা বানিয়ে দাও, কমপিউটারাইজড মেকানিকাল ব্রেন সহ।’

‘ওহ্, গড! এ কি সত্যি সম্ভব?’

‘কী বলো সম্ভব নয়! আমাদের সবার চোখের সামনে ঘটেছে, কাজেই অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। জার্মান ওই বিজ্ঞানীদের মেরে ফেলা হয়েছে—অজুহাত হিসেবে আমাদেরকে বলা হয় তাঁদের পূর্ব-পুরুষরা নাৎসী ছিল, বহু ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে খুন করেছে তারা।

‘ডক্টর উলফ দম্পতি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদেরকে মেরে ফেলা হবে। তাই তোমার ক্লোন তৈরি করার সময় তার ভিতর কিছু ত্রুটি রেখে গেছেন। সে-সব ত্রুটি দূর করার জন্যে মেরিন রিসার্চ ল্যাবে গবেষণা করছি আমরা। শুধু তাই নয়, নতুন ক্লোন অ্যান্ড মেকানিকাল সাবজেক্টও তৈরি হচ্ছে ওখানে।’

‘তৈরি হচ্ছে মানে...কাজ কতদূর এগিয়েছে?’

‘আকার-আকৃতিতে পুরোপুরি ম্যাচিউরডই বলা যায়, তবে মারাত্মক কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে এখনও।’

‘কী রকম?’

‘একটা বাদে বাকিগুলোর রেসপিরেটরি অরগ্যান ঠিক মত কাজ করছে না, ফলে পানি ভর্তি ভ্যাট থেকে বের করা যাচ্ছে না ওদেরকে—বের করলেই মারা যাবে।’

‘একটার বেলায় কাজ করছে—কেন?’

‘ওটার কৃত্রিম রেসপিরেটরি অরগ্যান এক্সপেরিমেন্টালি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বাকিগুলোর বেলায়ও তাই করা হবে, তবে তাতে সময় লাগবে দেড় মাস।’

‘সব মিলিয়ে এরকম ক’টা সাবজেক্ট তৈরি করা হচ্ছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘দশটা। সবাই তারা তোমার মত এসপিওনাজ এজেন্ট।’

‘কোন্ দেশের তারা? কী নাম?’

‘ওদের বেশিরভাগই তোমার পরিচিত, রানা। মালয়েশিয়ান, জর্দানী, মিশরীয়, পাকিস্তানী, ভারতীয়, সিরিয়ান...’

বাকিটা রানার শুনবার ধৈর্য হলো না, জানতে চাইল, ক্লোন তৈরি করার জন্য আমার জিন কোথায় পেল ওরা?’

‘মোসাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার লড়েছ তুমি। ইজরায়েলেও এই প্রথম ঢুকছ না। তোমার খানিকটা চামড়া বা এক-আধটা চুল যোগাড় করা কী এতই কঠিন?’

তাই তো, ভাবল রানা। ‘আচ্ছা, আমার ক্লোন আমার ভাষা শিখল কীভাবে? এমন কী আঞ্চলিক ভাষা পর্যন্ত জানে সে। এটা কীভাবে সম্ভব?’

‘এ তো পানির মত সোজা,’ বলল ডেব্রা। ‘বললাম না, ক্লোনের ব্রেনটা কমপিউটারাইজড এবং মেকানিকাল? সত্যিকার মানুষকে যেভাবে ভাষা শেখাতে হয়, ডক্টর উলফদের তৈরি ক্লোনকে সেভাবে তা শেখাতে হয় না। তোমার জিন থেকে ল্যাবে প্রথমে তৈরি করা হয়েছে তোমার ব্রেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তোমার সমস্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, তথ্য, ভাষা, প্রশ্ন, উত্তর ইত্যাদি জমা আছে ওই ব্রেনেও। সে-সব একটা কমপিউটারের ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে, তারপর আরেক কমপিউটারে স্থানান্তর করা হয়েছে—এই দ্বিতীয় কমপিউটারটা আছে তোমার ডাবলের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি দ্বিতীয় ব্রেনে।’

‘মাই গড!’

‘এক মিনিট,’ বলে চাদরটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে বিছানা থেকে নামল ডেব্রা। ‘এখনই আসছি।’ দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকল সে।

বিছানায় শুয়ে মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে রানা। শাকিলার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য পেয়ে গেছে ও। ভাবছে ডক্টর ডেব্রার কাছ থেকে আর কী সাহায্য চাওয়া যায়। সে যে ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কাজে সন্তুষ্ট নয়, এটা তো পরিষ্কারই বোঝা গেছে।

দরজার শব্দ হতে ঘাড় ফেরাল রানা।

প্যান্ট, জিনসের শার্ট আর জ্যাকেট পরেছে ডেব্রা আব্রাহাম। তার ডান হাতে চকচকে একটা অটোমেটিক। সেটা সরাসরি রানার বুকে তাক করে ধরা।

স্থির হয়ে গেছে রানা। ভুরু কোঁচকাল। 'এর মানে?'

ঠোঁট বাঁকা করে শয়তানি হাসি হাসল ডেব্রা। 'এর মানে হলো তোমার খেলা শেষ, মিস্টার মাসুদ রানা।'

নয়

ওয়ালথার আর ছুরিটা রানার নাগালের মধ্যেই। কিন্তু ওগুলোর উল্টোদিকে পাশ ফিরে আছে ও। হাতটা যদি আন্দাজে সেদিকে বাড়ায়, ওয়ালথারের বাঁট ছোঁয়ার আগেই ট্রিগার টেনে দেবে ডেব্রা। 'বেশ, বোকার মত তোমার ফাঁদে পা দিয়েছি আমি। এখন কী?'

'এর জন্যে যতটা না তোমার বোকামি দায়ী, তারচেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্ব আমার অভিনয়ের।' হাসল ডেব্রা। 'তোমাকে গড়গড় করে এত সব টপ সিক্রেট ইনফরমেশন দিয়েছি, কার সাধ্য আমাকে ইজরায়েলিদের পরম শত্রু বলে মনে না করে? সে

যাক। এখন ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরো—সাবধান, ভুলেও পিস্তল আর ছুরিটার দিকে তাকাবে না।' দু'পা এগিয়ে এল ডেব্রা।

তার চোখেমুখে দৃঢ় ভাব লক্ষ করে দমে গেল রানা। সন্দেহ নেই, এ খুব শক্ত ঘানি। তার কথামত বিছানা থেকে অস্ত্র দুটোর উল্টোদিকের মেঝেতে নামল ও। মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কাপড় পরতে যাবে, বাধা দিল ডেব্রা।

'আইডি দুটো নিশ্চয় তোমার সঙ্গে আছে, পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

'কী করে জানলে ওগুলো আমার কাছে?' রানা বিস্মিত।

'আন্দাজ করেছি। তার কারণও আছে। আমার ফ্ল্যাটের সামনে ছেঁড়া কাপড়চোপড় আর ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে পায়চারি করতে দেখেছি তোমার ডাবলকে। ছ'তলা থেকে নীচে নেমে এসে দেখি, সে নেই। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে তোমার হোটেলে এসে বসে ছিলাম।'

আইডি দুটো জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে ডেব্রার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল রানা।

অত্যন্ত হুশিয়ার মেয়ে, চোখ নামিয়ে ওগুলোর দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। রানা যখন কাপড় পরছে, ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, তখন সামনের দিকে ঝুঁকে মেঝে হাতড়ে খুঁজে নিল। 'সঙ্গে নিয়ে ঘুরে তো বেড়াচ্ছ, জানো এই ইস্পাতের চাকতি কী কাজে লাগে?'

রানা বেল্ট পরছে কোমরে। এটায় শুধু টাকা নয়, আরও অনেক কিছু আছে। 'না।'

'ডিস্কের এক পিঠের সাংকেতিক চিহ্নগুলো স্ক্যানিং মেশিন দিয়ে অনুবাদ করলে ওর মেকানিকাল ব্রেনের নম্বর, আকৃতি, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পাওয়া যাবে। সম্ভাব্য ত্রুটি সারানোর জন্যে খুব দরকার।'

'আর উল্টোপিঠের ফোঁটা তিনটে? আঙুল ছোঁয়ালে উঁচু উঁচু

লাগে—ওগুলো?'

'তিনটে বোতাম বা ফোঁটার তিন রকম কাজ,' বলল ড্রেবা। হঠাৎ হাসল সে। 'আর মাঝখানের সুইচটা...থাক। শোনো, ভেবো না বোকামি করে এত সব গোপন তথ্য বলে দিচ্ছি তোমাকে। বলছি, কারণ জানি যে আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণ বেঁচে আছ তুমি।

'সাদা বোতামটা টিপলে চোখ থেকে লেযার বেরোয়—অদৃশ্য আলো এত ভয়ঙ্কর যে তোমার শরীর পুড়ে যাবে। নীলটা টিপলে যে-কোন ক্ষত মাত্র দশ মিনিট থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে সেরে যাবে—তোমার নয়, তার।'

রানার কাপড় পরা শেষ, শুধু জ্যাকেটটা হাতের ভাঁজে ঝুলছে।

'আর সবুজ বোতামটা টিপলে কী হবে? ওটা টিপলে গায়ে চলে আসবে অসুরের বল। হারকিউলিস পুনর্জন্ম নিলেও তার সঙ্গে পারবে না। এই বোতামটা টিপতে পারেনি বলেই মাছ ধরার ট্রলারে তোমার সঙ্গে হেরে যায় সে।'

চমকে উঠে ডেব্রার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'তুমি কী করে জানো? তোমার সঙ্গে তার তো দেখাই হয়নি!'

'না, সত্যি দেখা হয়নি,' মুচকি হেসে বলল ডেব্রা। 'ফ্ল্যাট থেকে নীচে নেমে আমি তাকে খুঁজে পাইনি, কারণ আশপাশে কোথাও লুকিয়েছিল সে। তারপর আমি সোজা এখানে চলে আসি—আমার পিছু নিয়ে তোমার ডাবল বা ক্লোনও হোটেল পর্যন্ত চলে এসেছিল।

'আমি এক মোসাদ এজেন্টের কাছ থেকে স্যুইটের চাবি নিয়ে সোজা এখানে উঠে এসেছি। আর আমাদের মাসুদ রানা বাইরে থেকে ফোনে যোগাযোগ করেছে আমার সঙ্গে।'

'তার সমস্যাটা কী?' জানতে চাইল রানা। 'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স বা মোসাদ হেডকোয়ার্টারে যায়নি কেন? তাকে আমি

থিয়েটারের বাইরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি–কর্নেল জারকা বা কর্নেল হেজাজের সঙ্গে দেখা করেনি কেন?'

'সেজন্যে তুমি দায়ী!' হঠাৎ রাগে লালচে হয়ে উঠল ডেব্রার চেহারা। 'মাথাটাই তো ওর প্রাণ, আর সেই মাথাতেই তুমি মেরেছ! তার মেকানিকাল ব্রেনের মেমোরি সেল নড়ে গেছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঠিকানা ভুলে গেছে সে, বহু মানুষের চেহারা মনে করতে পারছে না।'

'তা হলে তোমার ঠিকানা মনে পড়ল কীভাবে? তোমাকে চিনতেও তো পেরেছে।'

'ওর কোটের পকেটে আমার একটা ফটো ছিল,' বলল ডেব্রা। 'ওর তো ভুলে যাওয়া স্বভাব, তাই ফটোর পিছনে ঠিকানা লিখে উপহার দিয়েছিলাম ওকে। পানিতে ভিজে গেলেও, ঠিকানাটা পড়তে পেরেছে।'

'ট্রলার থেকে পড়ার পর সে বাঁচল কীভাবে?'

হাসল ডেব্রা। 'তোমার ক্লোন ভাইকে তৈরি করা হয়েছে উভচর করে, রানা। কিছুক্ষণ সাঁতরাবার পর ওকে একটা ইজরায়েলি জেলে-নৌকা পানি থেকে তুলে নেয়।'

'ভুলে যাওয়া স্বভাব, অথচ মনে রাখল কীভাবে ট্রলারে আমার সঙ্গে মারামারি হয়েছে তার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হেসে উঠল ডেব্রা। 'আরে, নিজের সঙ্গে মারামারি হলে সেটা কি কেউ ভুলতে পারে? অনেক কিছু ভুলে গেলেও, তোমার অর্থাৎ নিজের চেহারাটা সে ভোলেনি। তবে থিয়েটারে তোমাকে ওর ঢুকতে দেখাটা ছিল স্রেফ কাকতালীয় একটা ব্যাপার।'

'ফোনে তা হলে তার সঙ্গেই কথা বলছিলে তুমি?'

মাথা নাড়ল ডেব্রা। 'তুমি আসার দশ মিনিট আগে তার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তুমি যখন এলে তখন আমি কর্নেল জারকার সঙ্গে কথা বলছিলাম। উনি এখন শাকিলা মেহরুনের সঙ্গে অভিসারে রয়েছেন।'

'তাকে খবরটা দিয়েছ তুমি? সবাই এখন জানে ব্যাপারটা?' শীত শীত করছে রানার।

মাথা নাড়ল ডেব্রা। 'না। এখনও কেউ কিছু জানে না। তবে তোমার খেলা শেষ। এবার চলো...' ইঙ্গিতে দরজাটা দেখাল সে।

'কোথায়?'

'আমার ফ্ল্যাটে।'

'কেন?'

'ওখানে তোমার ক্লোন অপেক্ষা করছে। তাকে আমি কথা দিয়েছি, ডিস্কটা সহ তার হাতে তুলে দেব তোমাকে। তার ইচ্ছে সে-ই কর্নেল জারকাকে খবর দেবে, তোমাকে মনের সাধ মিটিয়ে একটা ধোলাই দেয়ার পর।'

ডেব্রাকে এখানেই কাবু করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। জ্যাকেটটা এক হাত থেকে আরেক হাতে ঝোলাল ও। তারপর বলল, 'আমার একটা কৌতূহল হচ্ছে।' মেয়েটাকে অন্যমনস্ক করাই ওর উদ্দেশ্য।

'কী?'

'ক্লোন হোক আর যাই হোক, আমার ডাবলকে তুমি ভালবাস বলেই মনে হয়েছিল। অন্তত টেলিফোনে তোমার উচ্ছ্বাস আর আমাকে কাছে পাওয়ার আকুলতার কথা শুনে অন্য কিছু মনে না হবারই কথা। সে বেঁচে আছে জানো তুমি, অথচ তারপরও আমার সঙ্গে...'

'আমাকে তুমি স্বৈরিণী ভাবছ, এই তো? যা খুশি ভাবতে পারো। তবে আমার একটা ব্যাখ্যা আছে। এতে কোন ভুল নেই যে ভাল আমি নকলটাকেই বেসেছি, আসলটাকে নয়; কিন্তু আসলটা কেমন জানার একটা গোপন ইচ্ছে নিশ্চয়ই আমার ভেতর ছিল। ছিল বলেই আসলটার স্পর্শ পাবার জন্যে অমন বেপরোয়া, অমন পাগলপারা হয়ে উঠেছিলাম...'

'এখন কি অনুতপ্ত?'

কিছু চিন্তা না করেই জবাব দিল ডেব্রা। 'না।' একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল, তারপর বলল, 'তবে তার মানে এই নয় যে তোমাকে মারতে আমার হাত কাঁপবে–কাজেই সাবধান। আর কোন কথা নয়, চলো এবার।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে...'

আবার জ্যাকেটটা হাত বদল করবার সময় অকস্মাৎ ঝট করে বাতাসে ছোঁ মারল রানা কিছু একটা ধরবার ভঙ্গিতে, কিন্তু ধরতে পারল না। হলুদ একটা প্রজাপতি। যেন ওর গায়েই বসেছিল এতক্ষণ, উড়ে গিয়ে এখন দেয়ালে বসল, ডেব্রার কাছ থেকে হাত দুয়েক দূরে।

'কোত্থেকে এল ওটা?' ভুরু কুঁচকে তাকাল ডেব্রা, তবে প্রজাপতির দিকে নয়, রানার দিকে।

হাসছে রানা, দম আটকে রেখেছে। ডেব্রা পড়ে যাচ্ছে দেখে এক লাফে দূরত্বটা পেরিয়ে এসে এক হাতে তার পতন ঠেকাল, আরেক হাত দিয়ে পিস্তলটা ধরে ফেলল–নার্ভ গ্যাসের প্রভাবে জ্ঞান হারিয়েছে ডেব্রা, তার অসাড় আঙুল থেকে পড়ে যাচ্ছিল অস্ত্রটা।

ডেব্রাকে আস্তে করে কার্পেটে নামিয়ে রেখে দু'আঙুলে ধাতব প্রজাপতিটাকে ধরে খুদে একটা বোতামে চাপ দিল রানা। গ্যাসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল।

বিশ সেকেন্ড হয়েছে দম আটকে রেখেছে রানা। স্যুইটের সবগুলো জানালা খুলে দিয়ে প্রতিটি ঘরের ফ্যান ছেড়ে দিল। আরও পঁচিশ ত্রিশ সেকেন্ড পর খোলা জানালার বাইরে মুখ বের করে দিয়ে বাতাস নিল বুক ভরে।

দু'মিনিটের মাথায় ডেব্রার অচেতন শরীরটা ক্লজিটে ভরে ফেলল রানা। ওয়ালথার আর ছুরিটা নিজেদের জায়গায় ফিরে গেল। ডেব্রার হাতব্যাগ সার্চ করে কিছু টাকা, কিছু কসমেটিক্স

আর ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গেল। কাড থেকে জানা গেল–ডেব্রা আব্রাহাম একজন ইজরায়েলি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচ ডি; কর্মস্থল: মেরিন রিসার্চ ল্যাব।

ল্যাবের ঠিকানা নেই কার্ডটায়। তবে বাড়ির ঠিকানা আছে: মিশন হাউস, ৮৬৯ মোশে দায়ান রোড, তেল আবিব, ইজরায়েল।

ওটাই রানার পরবর্তী গন্তব্য। ওর ক্লোনটার সঙ্গে শেষবারের মত একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

'আমরা একটা নাইটক্লাবের বারে রয়েছি। শাকিলা লেডিসরুমে গেছে, সেই ফাঁকে ফোন করছি আপনাকে।'

'আমি শুয়ে পড়েছিলাম...নিশ্চয়ই জরুরি কোনও খবর?' জানতে চাইল কর্নেল হেজাজ।

'না,' বলল কর্নেল জারকা। 'হ্যাঁ। আসলে কতটুকু জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক বুঝতে পারছি না। ঘণ্টাখানেক আগে হঠাৎ আমাদের ল্যাবের ডক্টর ডেব্রা ফোন করেছিলেন। সঙ্গে শাকিলা রয়েছে, ফোনটা পেয়ে আমি একটু বিরক্তই হই। বললেন, আমি যেন বাকি রাতটা অ্যালার্ট থাকি, চমকে ওঠার মত একটা মেসেজ দেবে। উত্তরে আমি বললাম, আপনি বরং কর্নেল হেজাজের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। করেছেন না কি?'

'না। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। নম্বরটা দেখুন তো, ফ্ল্যাট থেকে ফোন করেছিলেন?'

'না।' এক মিনিট পর কর্নেল জারকা আবার বললেন, 'আমার মোবাইলে নম্বরটা রয়েছে। ল্যান্ড ফোন, তবে কোথাকার জানি না।'

'নম্বরটা বলুন, আমি এখান থেকে ডায়াল করছি। জিজ্ঞেস করি, তাঁর এরকম হেঁয়ালি করার মানে কী।'

কর্নেল জারকা নম্বরটা দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল।

শাকিলাকে লেডিসরুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে মোবাইল ফোনটা তাড়াতাড়ি পকেটে রেখে দিল সে।

'আমরা কি এখন ফিরব, আংকেল জারকা?' কাছে এসে জানতে চাইল শাকিলা, চেয়ারে বসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল নিজের গ্লাসে। 'আমি ক্লান্ত।'

'তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?' অস্থির দেখাচ্ছে কর্নেল জারকাকে, বোধহয় খেয়ালই করেনি শাকিলা আবার তাকে আংকেল বলে সম্বোধন করল।

'কী প্রতিশ্রুতি?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল শাকিলা, গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে।

'তুমি আমাকে কথা দিয়েছ, আজ রাতে আমার প্রস্তাবটা অন্তত মন দিয়ে শুনবে।'

চিন্তা-ভাবনা করে অনেকক্ষণ পর জবাব দিল শাকিলা, 'ফ্ল্যাটে ফেরার পথে গাড়িতে বসে আপনার কথা শুনব।'

'না, শাকিলা, তা হয় না। কথাটা আমি তোমাকে নিভৃতে বলতে চাই। আমার প্রস্তাব বিবেচনার জন্যে একটা নিরুপদ্রব সময় পেতে হবে তোমাকে।'

'তা হলে এখানে বা অন্য কোন রেস্তোরাঁয় বসতে পারি আমরা,' বলল শাকিলা।

'আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যাবে,' রায় ঘোষণার মত গম্ভীর সুরে বলল জারকা।

'না। এত রাতে তা সম্ভব নয়,' প্রয়োজনের সময় শাকিলাও কঠিন হতে জানে।

'তা হলে তোমার ফ্ল্যাটে। এই দুটো জায়গার একটা হতেই হবে, শাকিলা।' হঠাৎ অসহায় দেখাল কর্নেলকে। শাকিলা কিছু বলবার আগেই তার পকেটে মোবাইলটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো, আমি এখুনি আসছি,' শাকিলাকে বলল সে। শাকিলা চলে যেতে মোবাইল সেট বের করে অন করল।

‘বলছি।’

‘ফোন নম্বরটা পাম বিচ হোটেলের,’ অপরপ্রান্ত থেকে কর্নেল হেজাজের উত্তেজিত গলা ভেসে এল। ‘রানার স্যুইটে বেশ কিছুক্ষণ রিঙ বাজল, কিন্তু কেউ রিসিভার তোলেনি। রিসেপশনকে নির্দেশ দিই, স্যুইট থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট করুক।’

‘বোঝাই যাচ্ছে রিপোর্ট ভাল নয়।’

‘ডক্টর ডেব্রা মারা গেছেন,’ জানাল কর্নেল হেজাজ। ‘মৃত্যুর কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে কোন আঘাতের বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। লাশটা পাওয়া গেছে ক্লজিটে।’

‘হায় মুসা! রানা?’

‘স্যুইটে তাকে পাওয়া যায়নি,’ বলল হেজাজ। ‘সুটকেসটাও নেই।’

‘ডেব্রাকে ভালবাসত সে, খুন করবে কেন?’

‘আপনি চোখ বুজে থাকতে চাইছেন,’ রাগের সুরে অভিযোগ করল কর্নেল হেজাজ। ‘আবারও বলছি, আমার সন্দেহ হচ্ছে এয়ারপোর্টে আমি যাকে রিসিভ করে আনলাম সে আমাদের ক্লোন অ্যান্ড মেকানিকাল সাবজেক্ট নয়।’

‘ঠিক আছে, এখন তাকে ধরুন। ধরে ল্যাবে এনে পরীক্ষা করুন। সে যদি আসল রানাই হয়, ইন্টারোগেট করে বের করুন আমাদের ক্লোনটা কোথায়, কী উদ্দেশে ইজরায়েলে ঢুকেছে সে।’

‘ক্লোনটা জাহান্নামে যাক। আরও দশটা তৈরি করছি আমরা।’

‘এখন তা হলে কী করব আমরা?’ জানতে চাইল কর্নেল জারকা।

‘রাত তো অনেক হলো, প্রায় বারোটা, অনুষ্ঠানের পর আমাদের শিল্পীও নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এবার তাঁকে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিলে হত না? তাঁর তো অন্য কাজও থাকতে পারে।’

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল কর্নেল জারকা। 'আমি চাই না কেউ আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাক।'

'কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতে বলছি, কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে তো নাক গলাচ্ছি না। রানাকে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে আমাদের একজন এজেন্ট তার পিছু নিয়েছিল। কিন্তু তাকে খসিয়ে মোসে দায়ান রোডের দিকে চলে গেছে রানা।'

'ওই রোডে ডক্টর ডেব্রার ফ্ল্যাট। তাকে তো মেরেই ফেলেছে, তাই না, তা হলে তার ফ্ল্যাটে কেন যাচ্ছে রানা?' জানতে চাইল কর্নেল জারকা।

'সেটাই আপনাকে আমি দেখে আসতে বলছি।'

'আর আপনি? আপনি কী করবেন?'

তিক্ত হাসল কর্নেল হেজাজ। 'আমি কী করব? তাও মুখ ফুটে আপনাকে বলতে হবে? আমি আমাদের জাতীয় গর্ব, শিল্পী শাকিলা মেহরুনের ওপর নজর রাখব। কোন মোহগ্রস্ত লোকের পক্ষে তো আর এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।'

'কেন...কোন যুক্তিতে...শাকিলা কী করেছে যে তার ওপর নজর রাখতে হবে মোসাদকে?' খেপে উঠল জারকা।

'আপনাকে আগেও আভাস দিয়েছি, আপনি কান দেননি, না বোঝার ভান করেছেন, কিংবা গুরুত্ব দেননি। শাকিলা মেহরুনের সঙ্গে লন্ডনে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন উঁচু পদের অফিশিয়ালের যোগাযোগ হয়েছিল। সেটা প্রায় তিন বছর আগের কথা। তারপর থেকে একজন সন্দেহজনক লোক আপনার বন্ধু-কন্যার সঙ্গে দু'তিন মাস পরপর দেখা করেছে।

'আমার নির্দেশে সেই লোকটাকে আমাদের ক্লোন সাবজেক্ট, রানা নাম্বার টু, ফলো করেছিল। লোকটাকে সে মেরে ফেলে।'

'আপনার নির্দেশে মেরে ফেলল, অথচ দেশে ফিরে এ-বিষয়ে আপনাকে কিছু বললই না?' জারকা বিস্মিত।

'সেজন্যেই তো বলছি, যে ফিরে এসেছে সে আমাদের ক্লোন

রানা নয়। এটা আসলটা—ইজরায়েলের এক নম্বর শত্রু।'

একটা ঢোক গিলল কর্নেল জারকা। 'সে তো প্রতিবারই সব কিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। এবার কেন এসেছে?'

'আপনার দুর্বলতা, শাকিলা মেহরুনকে ইজরায়েল থেকে বের করে নিয়ে যেতে।'

'মুসা! হায় মুসা!'

'গুরুত্ব আর বিপদটা যখন উপলব্ধি করতে পারছেন, তা হলে আপনিই ওকে পাহারা দিন—মানে, শাকিলা মেহরুনকে। এদিকটা আমি দেখছি। তবে একটা কথা—আমরা কিন্তু হাতে পেলেও এখনই শয়তানটাকে ধরব না। ধরব তখনই, যখন দেখব শাকিলা ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ঠিক আছে? আমরা ফাঁদ পাতব রিসার্চ ল্যাবে। সন্দেহ নেই ওটা ধ্বংস করার দায়িত্ব নিয়েও এসেছে সে এবার।'

রাত সাড়ে এগারোটার সময় মোশে দায়ান রোডে লোক চলাচল থেমে গেলেও সেনাবাহিনীর টহল আগের মতই চলছে। আত্মঘাতী ফিলিস্তিনিদের ভয়ে প্রতি মুহূর্তে তটস্থ হয়ে আছে গোটা দেশ। চেক-পোস্টগুলোয় থামানো হলো রানাকে। ওর দ্বিতীয় আইডি কার্ড এবং অন্যান্য কাগজ দেখে সসম্ভ্রমে স্যালুট করল সৈনিকরা, একজন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের যেমনটি প্রাপ্য। সার্চ করবার কোন চেষ্টাই হলো না। সৈনিকরা জানে সশস্ত্র ও।

মিশন হাউস একটা ছয়তলা ভবন। দালানটা রাস্তার শেষ প্রান্তে, তারপর খোলা মাঠ। জ্যাকেটটা এখন রানার গায়ে রয়েছে, তা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা লাগছে ওর।

পাম বিচ হোটেল থেকে সাড়ে তিন মাইল রাস্তা হেঁটে আসতে হয়েছে রানাকে। ইজরায়েলের অন্যান্য শহরের মত তেল আবিবেও রাত দশটার পর ট্যাক্সি চলা নিষিদ্ধ—গাড়িবোমার ভয়ে।

মিশন হাউসের সামনে দিয়ে দু'বার হেঁটে গেল রানা। ও টের পায়নি, তবে ছয়তলার জানালা দিয়ে ওকে দেখে ঠিকই চিনে ফেলেছে ওর ডাবল।

মিশন হাউসে ঢুকবার সময় হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলাল রানা। বারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

অন্ধকার মাঠের কিনারায় কালো সুট পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল হেজাজ। তার ফ্ল্যাট মোশে দায়ান রোডের আরেক মাথায়, কর্নেল জারকার সঙ্গে ফোনে কথা বলবার পর এখানে পৌঁছাতে মাত্র পাঁচ মিনিট লেগেছে তার।

রানাকে ঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলাতে দেখে কর্নেল হেজাজ আন্দাজ করল: ও ভাবছে, শাকিলার সঙ্গে কখন দেখা করবে।

আমরাও অপেক্ষা করছি, ভাবল সে, দু'জনে এক হও। প্রমাণসহ মেহরুনকে অ্যারেস্ট করতে পারলে এক ঢিলে দুটো পাখি মারা হয়। দেশের একজন শত্রুকে, একজন বিদেশী স্পাইকে নিষ্ক্রিয় করা হবে; আর হবে কর্নেল জারকার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। আমার অনেক দিনের সাধ বুড়ো ভামটার পাছায় কষে একটা লাথ্ মারি। শাকিলাকে স্পাই, রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে অ্যারেস্ট করতে পারলে ঠিক সেটাই মারা হবে—অন্তত আমি তাই মনে করি।

তারপর বাস্তবে ফিরে এসে ভাবল—এই রানা কি নকল রানা, অর্থাৎ ক্লোন? না কি আসলটা? নকল হোক বা আসল, ডক্টর ডেব্রার ফ্ল্যাটে কী কারণে এল?

মাঠ থেকে রাস্তায় উঠে এল কর্নেল হেজাজ। মিশন হাউসের গেটের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

মিশন হাউসে কোন দারোয়ান বা কেয়ারটেকার নেই। গভীর রাতে ফ্ল্যাটবাড়ির লোকজন কেউ বোধহয় জেগেও নেই। অন্তত রানা কারও কোন আওয়াজ পাচ্ছে না।

দু'তলায় উঠল ও, তারপর তিনতলায়। প্রতিটি ল্যান্ডিঙের দু'পাশে চওড়া করিডর দেখা যাচ্ছে, দু'দিকে তিনটে করে ছয়টা ফ্ল্যাটের দরজা।

তিনতলা থেকে চারতলায় উঠতে শুরু করবে রানা, পায়ের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

উপরের কোন ফ্লোর থেকে নীচে নামছে কেউ। জুতো পরা এই পায়ের আওয়াজ অতি পরিচিত বলে মনে হলো রানার। দু'তিন সেকেন্ড চিন্তা করবার পর বিদ্যুচ্চমকের মত ধরা পড়ল ব্যাপারটা—এ তো ওরই পায়ের শব্দ!

কী ঘটছে বুঝতে বাকি থাকল না। ছ'তলার জানালা দিয়ে দালানটার সামনে ওকে সুটকেস হাতে হাঁটাহাঁটি করতে দেখে বোঝাপড়া করবার জন্য নীচে নেমে আসছে ওর ডাবল।

সময় নেই, সিঁড়ির গোড়া থেকে দ্রুত সরে এসে একটা দোরগোড়ার ছায়ায় লুকাল রানা।

পায়ের আওয়াজ নীচে নামছে। চারতলায় নামল। সেখান থেকে তিনতলায়।

উঁকি মেরে তাকে দেখল রানা। প্রায় একই পোশাক পরে আছে ওর ডাবলও; অন্তত ট্রাউজার, জুতো আর জ্যাকেটের রঙে সামান্যই পার্থক্য। ওর মতই দৃঢ়, অথচ সাবধানী পায়ে ধাপ বেয়ে নামছে সে, চোখ দুটো সতর্ক।

লোকটা দোতলায় নেমে গেল। তার পিছু নিয়ে রানাও এখন নামছে।

হঠাৎ করেই কর্নেল জারকার মাথায় চিন্তাটা জেগেছে—ডক্টর ডেব্রার ফ্ল্যাটে তাদের ক্লোন অ্যান্ড মেকানিকাল সাবজেক্ট লুকিয়ে নেই তো? কে জানে, সে হয়তো গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।

ছ'তলায় একবার ওঠা দরকার, ফ্ল্যাটে ঢুকুক বা না ঢুকুক।

রাস্তা ধরে মিশন হাউসের দিকে এগিয়ে আসছে কর্নেল

হেজাজ। গেটের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো।

গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে রানা। বেরিয়ে এসে থামল। ডানে-বাঁয়ে সাবধানে তাকাচ্ছে।

কর্নেল হেজাজ হতভম্ব। তাকে দেখেও রানার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

তারপর তার দিকেই এগিয়ে আসতে দেখা গেল রানাকে। এটা কি আসল? ভাবল কর্নেল। না কি নকল?

তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, কী মনে করে থামল একবার, জিজ্ঞেস করল, 'আশপাশে কাউকে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন? আমার চেহারা নিয়ে?'

হতবিহ্বল মোসাদ কর্মকর্তা মাথা নাড়ল। তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে রানার ডাবল।

পাঁচ কি সাত সেকেন্ড দেরি হলেও কর্নেল উপলব্ধি করল, তাকে চিনতে পারেনি রানা, আর এই চিনতে না পারবার অর্থ হলো এটা আসল রানা নয়।

মাঠের দিকে দশ কদম এগিয়ে গেছে রানার ডাবল, পিছন থেকে কর্নেল হেজাজ বলল, 'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না, রানা?'

ধীরে ধীরে ঘুরল রানার ডাবল। 'কে আপ...'

ঘাবড়ে গেল কর্নেল হেজাজ। ঘুরবার সময় রানার হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। শুধু বেরিয়ে আসেনি, পিস্তলটা তুলে তাকে গুলি করতে যাচ্ছে...

আতঙ্কিত কর্নেল হেজাজ খেয়াল করল না, নকল রানার দৃষ্টি তাকে ছাড়িয়ে তার পিছন দিকে চলে গেছে। তাদের ক্লোন তাকে চিনতে পারছে না বলে মারাত্মক একটা সেমসাইডের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, এটা মনে করে আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল সে। 'করো কী! আমি মোসাদ অফিসার! কর্নেল হেজাজ! তুমি আমাকে চেনো! কী করো!' চেঁচিয়ে উঠে, বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে দু'হাত

সামনে বাড়িয়ে ছুটল সে।

এই সময় নকল রানা তার পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল। তার কোন উপায় ছিল না, কারণ চিনতে-না-পারা প্রৌঢ় লোকটার পিছনে সে তার পরম শত্রুকে দেখতে পাচ্ছে—আসল মাসুদ রানাকে।

গেট থেকে আগেই বেরিয়েছে রানা। হাতের উদ্যত পিস্তল তাক করে ট্রিগার টেনে দিল।

নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। রাত যত গভীর হয়, শহরের চারদিক থেকেই এ-ধরনের গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। আশপাশের জানালাগুলো বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

নকল রানার করা গুলিটা সরল রেখা ধরে তার শত্রুর দিকেই ছুটল। কিন্তু বুলেটের সরল পথে চলে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল কর্নেল হেজাজ। বলা যায় বুক পেতে দিল। তারপর একটা ঝাঁকি। হৃৎপিণ্ডের উপরটা হাত দিয়ে চেপে ধরল সে। এক পলক পরে করা আসল রানার বুলেটটাকে পথ করে দিল কুঁজো হয়ে গিয়ে।

রানার ওই বুলেট ওর ক্লোনের কপালে টিপ পরিয়ে দিল।

ট্রিগারে চাপ পড়ায় আরেকটা গুলি বেরুল নকল রানার পিস্তল থেকে। হেজাজ ইতিমধ্যে দু'তিনবার হোঁচট খেয়ে একদম কাছে চলে এসেছে, ফলে এই বুলেটটাকেও বাধা দিল সে।

কপালে ফুটো নিয়ে ঢলে পড়ছে নকল রানা।

পকেট থেকে তার দ্বিতীয় আইডি কার্ড ইস্পাতের চাকতিটা বের করল রানা। ডিস্কটার একপিটের মাঝখানে, প্লাস্টিকের খুদে বুদ্বুদের ভিতর অত্যন্ত ছোট একটা জিনিস রয়েছে। রানার মনে পড়ল, বস্ বলেছিলেন, বিসিআই টেকনিশিয়ানদের ধারণা এটা সেলফ-ডেসট্রাকশন সুইচও হতে পারে।

প্লাস্টিকের বুদ্বুদটা ভেঙে ভিতরের ডায়ালটা ঘোরাতে শুরু

করল রানা। দেখা গেল মাত্র একদিকে ঘোরে ওটা। অল্প একটু ঘুরবার পর ডায়ালটায় রঙিন আলো ফোটে।

বিশ সেকেন্ড ঘুরিয়ে অনেক রকম আলো পেল রানা–নীল, বেগুনি, সবুজ, হলুদ। শুধু লাল বাদে।

তারপর লালও জ্বলল। সঙ্গে সঙ্গে 'ধুপ' করে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। মুখ তুলে রানা যে দৃশ্য দেখল, জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না।

ঢলে পড়া ওর ডাবলের চোখ, নাক ও কান থেকে বহুরঙা আলো আর আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে, ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খেলে সাধারণত যেমনটা ঘটতে দেখা যায়। তবে তার বাকি শরীরটার পরিণতি হলো অকল্পনীয়।

লোকটার হাড় এবং মাংস রানার চোখের সামনে যেন গলে গেল। কাদার একটা স্তূপের মত লাগছে দেখতে। সেই স্তূপের ভিতর এখনও ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ আওয়াজ করে মাঝেমধ্যে স্পার্ক করছে কিছু তার।

কর্নেল হেজাজের লাশটা অন্ধকার মাঠে টেনে আনল রানা। ওর ডাবলের তরল অবশিষ্টকে মানুষ বলে চিনবার কোন উপায় নেই, কাজেই সরাবার কোন প্রয়োজনও নেই। হাতে সুটকেস নিয়ে মাঠটা আড়াআড়িভাবে পার হচ্ছে ও। দূরে স্ট্রিট লাইট দেখা যাচ্ছে।

পরবর্তী গন্তব্য শাকিলা মেহরুনের ফ্ল্যাট। ম্যাপে চোখ বুলিয়ে আগেই রানা দেখে রেখেছে সেটা কোনদিকে।

দশ

রাত সাড়ে বারোটায় তেল আবিবের রাস্তায় প্রাইভেট কারও কদাচ দেখা যাচ্ছে। ফুটপাতে দু'পাঁচজন পথিক আছে, তাদের একজন রানা। প্রতিটি রাস্তায় একবার করে সার্চ করা হয়েছে প্রত্যেককে, আইডি কার্ড দেখে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এত রাতে কোথায় যাচ্ছে তারা—শুধু রানাকে বাদে। ওর কার্ড দেখে সার্চ করবার বদলে স্যালুট ঠুকেছে চেক পোস্টের সৈনিকরা।

দমকা বাতাস আর ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেও ঘামছে রানা। জানে আর কোন বিকল্প নেই, তবে হাতে সুটকেস নিয়ে এভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক এখন।

ডেব্রা ওর হোটেল স্যুইট থেকে কর্নেল জারকাকে ফোন করেছিল। কর্নেল জারকা যদি এখন ডেব্রার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়, প্রথমেই খোঁজ নেবে ওর হোটেলের স্যুইটে।

তারপর রানা ভাবল, জারকা সম্ভবত এ-খবরও জানে যে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ও। বাইরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক ওর পিছু নিয়েছিল। নিশ্চয়ই মোসাদের অপারেটর, অর্থাৎ হেজাজের লোক। সে হেজাজকে রিপোর্ট করেছে, হেজাজ জানিয়েছে জারকাকে।

ধরে নিতে হয় ডেব্রার লাশ ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে ওরা। কিংবা আর কিছুক্ষণের মধ্যে পেতে যাচ্ছে।

মিশন হাউসের সামনে কাদার মত মাংসের স্তূপ আর ছেঁড়া তার দেখে সাধারণ কোন মানুষ হয়তো বুঝবে না জিনিসটা কী ছিল। তবে মাঠে পড়ে থাকা কর্নেল হেজাজের লাশ টহল পুলিশের চোখে পড়লে মোসাদ আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ঠিকই দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবে।

ওর ডাবল বেঁচে নেই, এটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর রাস্তা-ঘাটে ওকে দেখা গেলে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হবে সহজেই

অনুমেয়।

হন-হন করে এক ঘণ্টা হেঁটে এসে তেল আবিবের পশ এলাকায় ঢুকে পড়ল রানা। এদিকে সিকিউরিটি আরও কড়া, কারণ মন্ত্রী-মিনিস্টার থেকে শুরু করে সমাজের নামকরা সব লোক বাস করে এদিকে। বিদেশী দূতাবাসগুলোও এই এলাকায়। মেক্সিকান দূতাবাসকে পাশ কাটানোর সময় বন্ধু রিকার্ডো বারকুচি আর কনসুয়েলা বারকুচির কথা একবার ভাবল রানা। মিশন সফল হলে ইজরায়েল ত্যাগ করবার জন্য তাদের সাহায্য নিতে হবে ওকে।

একটা চেক পোস্টে থামানো হলো রানাকে। দ্বিতীয়বার ওকে দাঁড় করাল একটা টহল পার্টি। কাগজ-পত্র তো দেখাতে হলোই, জেরার জবাবে বলতেও হলো যে শিল্পী শাকিলা মেহরুনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ও।

তারা অবশ্য কোন ঝামেলা করল না। আগের মতই ভয় মিশ্রিত সমীহ আর স্মার্ট স্যালুট পেল রানা। আসলে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট বলে কথা!

রানা ভয় পাচ্ছিল শাকিলার ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড থাকবে। তবে না, নেই।

ঠিকানা মিলিয়ে বিল্ডিংটা পাওয়ার পর ওটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল রানা, উদ্দেশ্য পিছন দিয়ে ঢুকবার কোন পথ করা যায় কি না দেখা। পিছনে দরজা একটা আছে বটে, কিন্তু তাতে এত বড় তালা ঝুলছে যে মাস্টার কী দিয়ে খোলা সম্ভব নয়। সরু একটা গলির ভিতর পাওয়া গেল লোহার প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি, দালানটার সাততলায় উঠে গেছে, কিন্তু সিঁড়ির গোড়ার দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। উপায় নেই, সামনের দরজা দিয়েই ভিতরে ঢুকতে হবে ওকে।

ফ্ল্যাট বাড়িটা প্রকাণ্ড কালো পাহাড়ের মত দেখতে। সামনের দরজার ভিতর আলোকিত হলওয়ে, একটা এলিভেটর আর

কার্পেট মোড়া এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দুটো করে ধাপ টপকাচ্ছে রানা। দোতলায় উঠবার পর এলিভেটরে চড়ল। সাততলায় পৌঁছে বেরিয়ে এল করিডরে। করিডরের ডান পাশের প্রথম দরজাটাই শাকিলা মেহরুনের। তবে ওখানে না থেমে শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে এল।

নাক বরাবর সামনে ছোট একটা দরজা। দরজার এই ছোট আকারই বলে দিল এটা আসলে ফায়ার ইস্কেপ-এ পৌঁছানোর পথ। দরজাটা খুলে উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল ওর আন্দাজ নির্ভুল—লোহার সেই প্যাঁচানো সিঁড়িটা নেমে গেছে নীচের অন্ধকার গলিতে।

ফিরে এসে শাকিলা মেহরুনের দরজায় মৃদু নক করল রানা। ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। গোটা বাড়ি আশ্চর্য সেই পরিচিত নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে, প্রতিটি পরিবারের লোকজন যখন অঘোরে ঘুমায়।

মাস্টার কী দিয়েও তালা খুলতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। বিশ সেকেন্ডের কাজ শেষ করতে সময় নিল পাঁচ মিনিট। অন্ধকারে পা ফেলে ভিতরে ঢুকল, তারপর নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

রানা ভিতরে ঢুকেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, কর্নেল জারকার জিপটা এসে থামল শাকিলার ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। নীচে নেমে একটা হাত বাড়িয়ে দিল জারকা, শাকিলাকে নামতে সাহায্য করল। ধরবার পর হাতটা ছাড়তে চাইছে না লোকটা, বাধ্য হয়ে জোর করে নিজেকে মুক্ত করল শাকিলা।

হঠাৎ দেখা গেল রাস্তার উল্টোদিকের একটা গেটের ভিতর থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে আসছে। যেমন লম্বা তারা, তেমনি চওড়া। দু'জনেই জিনস আর কালো জ্যাকেট পরে আছে। রাস্তা

পেরিয়ে এসে একযোগে স্যালুট করল তারা কর্নেল জারকাকে। এরা দু'জন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট—মেজর কারফু আর মেজর ল্যাঙ্কি।

তাদেরকে দেখে গলা শুকিয়ে গেল শাকিলার। রানার কথা মনে পড়ে গেছে তার।

'ক্লোন অ্যান্ড মেকানিকাল সাবজেক্ট, মাসুদ রানার কার্বন কপি—নেই, সার,' মেজর ল্যাঙ্কি ফিসফিস করে রিপোর্ট করল।

'হোয়াট!' চাপা গলায় গর্জে উঠল জারকা। তারপর শাকিলার দিকে ফিরে জোর করে হাসল। 'প্লিজ, শাকিলা, তুমি ওপরে ওঠো, আমি এখনই আসছি।'

শাকিলা ক্লান্ত পায়ে গেটের ভিতর ঢুকল। সে ভাবছে, রাত বাজে একটা—রানা কি এসে ফিরে গেছে?

'তারচেয়ে বড় দুঃসংবাদ, সার,' বলল মেজর কারফু, 'কর্নেল হেজাজও খুন হয়েছেন।'

'ওহ্ মুসা! ওহ্ মুসা!'

'দু'জনকেই ডক্টর ডেব্রার ফ্ল্যাটের কাছে পাওয়া গেছে, সার। মাংসের স্তূপটা রাস্তায়, লাশটা রাস্তার পাশের অন্ধকার মাঠে। টহল পার্টির লোকজন দেখতে পেয়ে মোসাদ হেডকোয়ার্টারে খবর দেয়, সেখান থেকে খানিক আগে আমাদের রিসার্চ ল্যাবে মেসেজ পাঠায় ওরা।'

কারফু থামতেই ল্যাঙ্কি বলল, 'এর আগে ডক্টর ডেব্রার লাশ পাওয়া গেছে, সে তো আপনি জানেনেই। তিনটে খুনই বিদেশী ওই লোকটা করেছে—এমআরনাইন, আসল মাসুদ রানা।'

কারফু বলল, 'সে এখন মিস শাকিলা মেহরুনের ফ্ল্যাটে ঢুকে বসে আছে।'

ল্যাঙ্কি বলল, 'তাকে বা তার মত কাউকে বাড়িটার ভেতর ঢুকতে দেখেছি আমরা। ফ্ল্যাটে ঢুকতে পেরেছে, নাকি ছাদে উঠে বসে আছে, বলতে পারব না। আমরা আপনার নির্দেশের

অপেক্ষায় আছি, সার।'

শোল্ডার হোলস্টার থেকে পয়েন্ট ফোরটিফাইভ ল্যুগারটা বের করে একবার চেক করল কর্নেল জারকা। 'তোমরা ঠিক এখানে অপেক্ষা করো।' গেটের দিকে পা বাড়াল সে।

'সার, আমরা আপনার সঙ্গে থাকি। আপনাকে কাভার দেব।'

তিক্ত হাসি ফুটল জারকার ঠোঁটে। 'বিপদটা আমার নয়, কারফু। ওর কিংবা ওদের। সেটাই আগে স্পষ্ট করে জানতে হবে আমাকে।'

'সার,' এবার অনুরোধ করল ল্যাঙ্কি। 'আপনি বরং এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা দু'জন লোকটাকে বন্দি করি। তারপর তাকে ইন্টারোগেট করলেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'

মাথা নাড়ল কর্নেল জারকা। 'আরে না, সে-সময় এখনও আসেনি। আমার নিরেট, অকাট্য প্রমাণ দরকার...সে তোমরা বুঝবে না,' কথা শেষ করে গেট দিয়ে দালানের ভিতর ঢুকে পড়ল সে।

ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পেল এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাকিলা। 'কী ব্যাপার, শাকিলা? তোমাকে না বললাম ওপরে ওঠো!'

'ভাবলাম এক সঙ্গেই যাই,' বলল শাকিলা, কর্নেলের চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। বোতাম আগেই টিপেছিল। এলিভেটরের দরজা খুলে যেতে মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

জারকাও ঢুকল, তবে পাশে না দাঁড়িয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। একদৃষ্টে তাকিয়ে শাকিলার চোখে-মুখে তন্ন-তন্ন করে কী যেন খুঁজছে।

এলিভেটর উপরে উঠছে। চোখ তুলে একবার তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল শাকিলার বুক। কর্নেল জারকা তার দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যার অর্থ—আমি জানি তুমি কী করেছ!

'আপনি আমাকে কী একটা প্রস্তাব দেবেন বলেছিলেন,' মনে

করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল সে, ইচ্ছে করেই কথার শেষে 'আংকেল' বলল না।

'হ্যাঁ, বলব। চলো, আগে বসি,' বেসুরো গলায় বলল জারকা। নিজের কাছে রেখে এত বড়টি করবার পর, উন্মাদের মত ভালবাসবার পর, এই সৌন্দর্যের আধারটিকে নিজ হাতে খুন করতে হতে পারে—ভাবতে গেলে ভয় হচ্ছে, তার না হার্ট অ্যাটাক করে।

এলিভেটর থেকে সাততলায় বেরিয়ে এল তারা। করিডরটা খুঁটিয়ে দেখল কর্নেল জারকা। এখানে কারও লুকিয়ে থাকবার মত কোন জায়গা নেই।

হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করে ফ্ল্যাটের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল শাকিলা। লিভিংরুমে আলো জ্বলছে দেখে ধক করে উঠল বুক। তার স্পষ্ট মনে আছে, ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার সময় কোথাও কোন আলো জ্বলছিল না। এর একটাই মানে—ফ্ল্যাটে কেউ আছে! নিশ্চই মাসুদ রানা!

শাকিলার পিছু নিয়ে সিটিংরুমে ঢুকল কর্নেল জারকা। লিভিংরুমের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তেই কোটের পকেটে হাত ভরে ল্যুগারের বাঁটটা শক্ত করে ধরল সে। 'শাকিলা, ডার্লিং, তুমি কি লিভিংরুমের আলো জেলে রেখে বেরিয়েছিলে?' যতটা সম্ভব সহজ আর স্বাভাবিক সুরে কথা বলতে চেষ্টা করছে সে।

'মনে হয়...নিশ্চয় তাই। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে।' একটু থেমে আবার বলল শাকিলা। 'কষ্ট করে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আংকেল। আপনার দেরি হলে এজেন্টরা আবার না ওপরে উঠে আসে—গুড নাইট।'

'গুড নাইট?' আকাশ থেকে পড়ল জারকা, তবে স্পষ্ট বুঝল এজেন্টদের কথা বলে রানাকে সাবধান করে দিল শাকিলা। 'আবার ভুলে গেছ? তোমার না আমার একটা প্রস্তাব শোনার কথা?'

'না, মানে, অনেক রাত হয়েছে তো...'

'হ্যাঁ, সত্যি অনেক রাত হয়েছে,' বলল জারকা, শাকিলার পিছু নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল। চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে, ডান হাতটা এখনও কোটের পকেটে। 'বোধহয় আমার তরফ থেকে বাড়াবাড়িও অনেক হয়েছে। হয়তো এই রাতটাই আমাদের শেষরাত। কে জানে, কাল সকালে হয়তো তোমাকে আমি প্রস্তাবটা নাও দিতে চাইতে পারি।'

'আংকেল, এ-সব আপনি কী বলছেন?' কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শাকিলা লিভিংরুমের মাঝখানে। 'আপনার কথা তো কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!'

'এটা তো নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝেছ যে আমি তোমার প্রতি দুর্বল?' প্রসঙ্গটা সরাসরি পাড়ল কর্নেল।

'জী?'

'হ্যাঁ কি না?'

'না...মানে...হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি খেয়াল করেছি।'

'তোমার বাবার বন্ধু ছিলাম, সেজন্যে আমাকে ভালবাসা যায় না, এটা কোন যুক্তি নয়। বাপের বন্ধুকে তুমিই প্রথম বিয়ে করবে না। আমার বয়স তোমার তুলনায় অনেক বেশি, এটাও কোন অজুহাত হতে পারে না–কারণ, পুরুষ মানুষের আবার বয়স কী। পক্ষে বরং মস্ত একটা বাস্তব যুক্তি আছে–এটা ইহুদিদের আবাসভূমি, মুসলমানরা এখানে বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের মত অবাঞ্ছিত এবং অরক্ষিত; আমাকে বিয়ে করলে তুমি ইহুদি সমাজের একজন হিসেবে গণ্য হবে। আমি হব তোমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি, রক্ষক...'

'এটাই আপনার প্রস্তাব? আপনাকে বিয়ে করার?'

'হ্যাঁ, এটাই আমার প্রস্তাব। তবে এর মধ্যে একটা ওয়ার্নিং আছে।' দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে, দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে জারকা।

'ওয়ার্নিং? কী ওয়ার্নিং?'

'ওয়ার্নিংটা হলো, তোমার জীবনে যদি কিছু গোপন করার থাকে, সেটা এখুনি, এই মুহূর্তে আমাকে তুমি জানাবে। যত গুরুতর অন্যায়ই তুমি করে থাকো, সব আমি ক্ষমা করে দেব–রাষ্ট্রীয় ক্ষমাও আদায় করে দেব। তবে স্বীকার করতে হবে এখনই। কাল সকালে নয়।'

'আপনি আমাকে এভাবে অপমান করতে পারেন না!' রীতিমত তেজ দেখিয়েই কথাটা বলতে পারল শাকিলা, যদিও ভয়ে তার হাঁটু কাঁপছে। 'ছোটবেলা থেকে দেখছেন আমাকে। আপনি ভাবলেন কীভাবে...'

'তোমার সঙ্গে বিদেশী কোন এসপিওনাজ এজেন্ট যোগাযোগ করেছে?'

'আল্লাহ! এ-সব কী হচ্ছে! আমার মা-বাবাকে যেভাবে মারা হয়েছে, আপনারা কি বিনা অপরাধে আমাকেও...'

'পার্টিতে যে রানার সঙ্গে তোমার আলাপ হলো,' শাকিলার কথায় কান না দিয়ে বলে চলেছে কর্নেল জারকা, 'সে ছিল আসল রানা–আমাদের ল্যাবে তৈরি ক্লোন অ্যান্ড মেকানিকাল সাবজেক্ট নয়। সে তোমাকে কোনও মেসেজ দেয়নি? কোন টপ সিক্রেট ইনফরমেশন চায়নি? কিংবা নিরিবিলি কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেনি?'

'আপনি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন?' ভুরু কুঁচকে তাকাল শাকিলা। 'নিশ্চয়ই তাই!' জোর করে হেসে উঠল সে। 'শুনুন, কর্নেল জারকা, আপনার প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করছি না। তবে হ্যাঁ-ও বলছি না। আপনি যেহেতু কৌতুক করে আমাকে ভোগাচ্ছেন, তেমনি আমিও আপনাকে ঝুলিয়ে রেখে ভোগাব। আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার জন্যে এক হপ্তা সময় লাগবে আমার। এবার আপনি আসতে পারেন।'

'আর মাত্র একবারই জানতে চাইব। তোমাকে আমি বিশ্বাস

করি, শাকিলা। কিন্তু কী জানো, কর্নেল হেজাজ খুন হয়েছেন, আর তিনি বলে গেছেন...'

'ও আল্লাহ! এ কী শোনালেন!' গালে হাত দিল শাকিলা। 'কখন? কে...'

'...বলে গেছেন, তুমি নাকি ডাবল এজেন্ট! কথাটা কি সত্যি, শাকিলা? যদি সত্যি হয়ও, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব, শুধু আগামী দশ সেকেন্ডের মধ্যে তুমি স্বীকার করো।'

ঠিক আট সেকেন্ড চুপ করে থাকল শাকিলা। তারপর বলল, 'স্বীকার করলাম না।'

শাকিলার হাতটা ধরে মুখের সামনে তুলল কর্নেল জারকা। শাকিলা দেখল লোকটার চোখ দুটো ছলছল করছে। ওর হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেল সে। 'আমি যাচ্ছি,' বিড় বিড় করে বলল, তারপর বেরিয়ে গেল লিভিংরুম থেকে।

জারকার পিছু নিয়ে সিটিংরুমে ঢুকল শাকিলা, ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ করে আবার ফিরে এল লিভিংরুমে। দরদর করে ঘামছে সে।

'কোথায় আপনি, মিস্টার রানা?'

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালল রানা। কোথায় কী আছে দেখে নিয়ে সেটা তখনই আবার নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলে খোলা দরজা দিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল। কামরার ভিতর শাকিলা মেহরুন যে উপস্থিত ছিল, গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারল। বাথরুমে গোসল সেরে এখানে দাঁড়িয়ে কাপড় পাল্টেছে সে। তার পারফিউমের মিষ্টি সুবাস এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। দেয়াল হাতড়ে আলোটা জ্বালল রানা।

লিভিংরুমটা বেশ বড়। ওর সামনে একটা সাদা পাথরের ফায়ারপ্লেস। দু'পাশে দুটো বুককেস। বাঁ দিকে একটা কাউচ। ওটার পাশের দরজা দিয়ে ডাইনিংরুমে যাওয়া যায়। ডানে সবুজ

রঙের একজোড়া চেয়ার, তারপর কার্পেটের উপর ফেলা হয়েছে দুই সেট সোফা। সেট দুটোর মাঝখান দিয়ে আরেক দরজার দিকে যাওয়া যায়—ওদিকে হলওয়ে, বাথরুম আর বেডরুম। রানা বুঝতে পারছে শাকিলা মেহরুন এখনও কর্নেল জারকার সঙ্গে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লিভিংরুমের একদিকের দেওয়াল জুড়ে ঠাঁই পেয়েছে শাকিলার শিল্পী জীবনের সচিত্র ইতিহাস। ফটোগুলো এমন একটা ধারাবাহিকতা ধরে সাজানো হয়েছে, সেই ছোটবেলায় শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত তার ডান্সিং ক্যারিয়ারের পুরো চিত্রটা পাওয়া যায়। মুসলিমপ্রধান দেশগুলো বাদে দুনিয়ার প্রায় সব জায়গায় নাচ দেখিয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে সে। ছবিগুলো দেখা শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় ফ্ল্যাটের তালা খুলবার ক্লিক শব্দ ঢুকল রানার কানে।

এখন আর আলো নিভিয়ে তারপর কোথাও লুকাবার সময় নেই। এই মুহূর্তে লুকাতে হবে বুঝতে পেরে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল সুটকেসটা। এক সেট সোফার পিছনে, পরদার আড়ালে গা ঢাকা দিল। ঝাঁকি খেয়ে ওটা কাঁপছিল, দুই প্রান্ত ধরে স্থির করল তাড়াতাড়ি।

শাকিলার পিছু নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকছে কর্নেল জারকা। পরদার সরু ফাঁক দিয়ে তাদেরকে দেখল রানা, তাদের কথাও শুনতে পেল।

কর্নেল জারকা যেমন সারাক্ষণ কোটের পকেটে হাত ভরে পিস্তল ধরে রাখল, তেমনি রানাও হাতে রেখেছে ওয়ালথারটা।

জারকা যতই সতর্ক হোক, অনায়াসেই রানা তাকে খুন করতে পারত। কিন্তু শাকিলা ওকে কৌশলে সাবধান করে দিয়েছে—নীচে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্টরা অপেক্ষা করছে। গুলির আওয়াজ হলে সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে আসবে তারা। একা হলে এক কথা ছিল, রানাকে এখন পালাতে হবে শাকিলাকে নিয়ে।

প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, ধরা পড়ে যেতে হবে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল অপেক্ষা করে দেখবে কী হয়, তারপর পরিস্থিতি বুঝে যা করবার করবে।

আলাপ শেষে কর্নেল জারকাকে বিদায় করে দিল শাকিলা, দরজা বন্ধ করে আবার ফিরে এল লিভিংরুমে। চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আপনি, মিস্টার রানা?'

পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শাকিলার সামনে দাঁড়াল রানা। ও উত্তেজিত, তবে চোখে-মুখে দৃঢ় একটা ভাব। 'শোনো, আমাদের হাতে বোধহয় দু'মিনিট সময়ও নেই...'

'জানি!' শিউরে উঠল শাকিলা, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। 'ওরা বোধহয় সব জেনে ফেলেছে...'

'আমারই ভুল হয়েছে। ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি আমরা।' দ্রুত, অথচ স্পষ্ট স্বরে কথা বলছে রানা, মাথাটা কাজ করছে ঝড়ের বেগে। শাকিলা বাধা দেওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না, তাকে একরকম টানতে টানতে ফ্ল্যাট থেকে বের করে আনল ও, অপর হাতে পিস্তল। 'তবে এখনও তোমাকে নিয়ে ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে যেতে পারব আমি...'

'কীভাবে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল শাকিলা।

'মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনো,' নির্দেশের সুরে ফিসফিস করল রানা, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছে। 'এখন জিতবে সাহস আর বুদ্ধি। প্রথম কথা, দু'জনের একসঙ্গে ধরা পড়া চলবে না। তুমি আমাকে দেরি করিয়ে দেবে, তাই মেরিন রিসার্চ ল্যাবে আমি একা যাব। ঠিকানাটা দাও। আর ওই জায়গা সম্পর্কে কী জেনেছ সংক্ষেপে বলো আমাকে।' চারতলায় নেমে কান পাতল ও। নীচ থেকে জিপ স্টার্ট নেওয়ার শব্দ ভেসে এল।

'কর্নেল জারকা চলে যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল শাকিলা।

মাথা নাড়ল রানা। 'যাচ্ছে না, স্রেফ যাওয়ার ভান করছে। এই, মনে আছে, আমি একটা ম্যাপ চেয়েছিলাম?'

'আমাদের এখন ইজরায়েল ছেড়ে পালানো উচিত নয়?' ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল শাকিলা। 'ধরা পড়লে ওরা আমাদেরকে গুলি করে মারবে। রিসার্চ ল্যাব বাদ দিলে হয় না?'

'শাকিলা, আমি শুধু তোমাকে নিয়ে যেতে আসিনি,' বলল রানা। 'আমার অ্যাসাইনমেন্টের আরেকটা অংশ–প্রয়োজন হলে ওদের রিসার্চ ল্যাবটা ধ্বংস করে দেওয়া।

'ওখানে কমপিউটারাইজড মেকানিকাল ব্রেন সহ কৃত্রিম মানুষ, অর্থাৎ ক্লোন তৈরি করা হচ্ছে। ইজরায়েল সরকার ইহুদি বিজ্ঞানীদের দিয়ে গোটা দুনিয়ার জন্যে এক মহাবিপদ ডেকে আনছে। কাজেই ওই ল্যাব আমাকে ধ্বংস করতে হবে। কোথায় ওটা?'

'শহরের বাইরে, এখান থেকে বারো মাইল দূরে,' বলল শাকিলা। 'ইজরায়েল সরকারের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশাল একটা ফ্যাসিলিটি ওটা। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজন মত গবেষণা এবং পরীক্ষা চালায় ওখানে। ইজরায়েলি নেভির রিসার্চ ল্যাবটাও ওখানে। ভেতরে ঢোকা এক কথায় অসম্ভব। শুধু ডোবারম্যান কুকুরই আছে বারোটা।' হ্যান্ডব্যাগ খুলে রানার হাতে একটা ম্যাপ ধরিয়ে দিল সে।

ল্যান্ডিঙের অস্পষ্ট আলোয় ম্যাপটার উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা, জানতে চাইল, 'আর কী জানো?'

'আমি মাত্র একবার গেছি ওখানে। তা-ও সব ঘুরে দেখার সুযোগ পাইনি। তবে জানি দশটা ক্লোন তৈরি করা হচ্ছে। এ-ও শুনেছি যে একটা বাদে বাকিগুলোর এখনও কিছু ত্রুটি আছে। ওগুলো নাকি কোন না কোন দেশের এসপিওনাজ এজেন্ট...'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কোন গাড়ি বা মানুষ, কিছুই ওরা দেখতে পেল না। জিপটা যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে রওনা হলো ওরা। একটু পর বাঁক নিয়ে একটা গলিতে ঢুকল। গলির

মুখে, লাইটপোস্টের আলোয় শাকিলার দেওয়া ম্যাপটা আবার খুঁটিয়ে দেখল রানা। পাহাড় আর সাগর দিয়ে ঘেরা কয়েক হাজার একর জায়গা নিয়ে ইজরায়েলি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশাল একটা ফ্যাসিলিটি, ভিতরে এয়ারস্ট্রিপ ও হেলিপ্যাডসহ বিভিন্ন স্থাপনার কাঠামো, পেনসিল দিয়ে পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছে শাকিলা।

'নাম জানো তাদের?' তার কথার খেই ধরে জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল শাকিলা। 'না।'

'গোপন কাগজ-পত্র, ফর্মুলা, এ-সব কোথায় রাখা হয় জানো?'

'জানি। এ-ও জানি যে ওখানকার কোন তথ্য বিজ্ঞানীদেরও বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। সিকিউরিটি চিফ কর্নেল জারকা আর কর্নেল হেজাজকেও গার্ডরা চেক করার পর বেরুতে দেয়—সিস্টেমটা এতই কড়াকড়িভাবে পালন করা হয়। আমি এর কারণ জানতে চাইলে কর্নেল জারকা বললেন—ডক্টর উলফদের মূল ফর্মুলাটা এই ল্যাবেই শুধু আছে, ওটা চুরি হওয়া আর এক হাজার কোটি ডলার ডাকাতি হওয়া একই কথা। ডক্টর উলফরা হলেন...'

'থাক, ওদের সম্পর্কে জানি আমি,' বাধা দিল রানা। হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল। 'তোমাকে কী করতে হবে বলে দিচ্ছি...'

ত্রিশ সেকেন্ড পর রানা থামতে শাকিলা জানতে চাইল, 'আর আপনি?'

'আমাকে রিসার্চ ল্যাবটা ধ্বংস করে দিয়ে আসতে হবে।'

'ওখানে ঢোকা অসম্ভব, একথা জানার পরেও যাবেন আপনি?'

'রাকস্যাকটা যদি দুপুর একটায় নির্দিষ্ট জায়গায় পাই যাব, ঢুকব, বেরিয়েও আসব,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল রানা। 'তবে এই কাজটায় আমার সময় লাগবে।'

'সময় লাগবে…কত?'

'আগে থেকে বলা মুশকিল,' বলল রানা। 'তিনদিনও লাগতে পারে, আবার সাতদিনও লাগতে পারে। কড়া পাহারা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, এরকম একটা জায়গায় ঢুকতে হলে ঠাণ্ডা মাথায় প্রথমে পরিবেশটা বুঝতে হবে আমাকে। কাজ সেরে বেরিয়ে আসা সম্ভব, এটা বোঝার পরেই শুধু ভেতরে ঢুকব আমি।'

'আমি তা হলে…'

'তুমি আমার জন্যে ঠিক তিনটে দিন অপেক্ষা করবে,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'এরমধ্যে আমি না ফিরলে ওরা তোমাকে ইজরায়েল থেকে বের করে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দেবে।'

'আপনার না-ফেরার মানে…মারা যাবেন, এই তো?' শাকিলার চেহারা ম্লান।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল রানা। 'ঠিক আছে, চেষ্টা করব যাতে না মরি।'

এই সময় জিপের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা–কাছে চলে আসছে, তারপর ক্রমশ দূরে চলে গেল। একসময় আর শোনা গেল না। কোন্ পথ ধরে কোথায় যেতে হবে শাকিলাকে দেখিয়ে দিল রানা। সে চলে যেতে নিজেও রওনা হলো আরেকদিকে। যদি বেঁচে থাকে, আবার ওদের দেখা হবে।

এগারো

প্রকৃতি, মেধা আর টাকার সহায়তা থাকায় পাহাড়ী ঢালের নীচের

পেনিনসুলায় নিরাপত্তা আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার উৎকৃষ্ট একটা নমুনা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল না হলে ইজরায়েল সরকারের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের এই ফ্যাসিলিটিকে সবদিক থেকে আদর্শ বলে মেনে নিত রানা।

ম্যাপ দেখে সাগরে ঢুকে পড়া ত্রিভুজ আকৃতির জায়গাটা এত বড় হবে বলে ধারণা করা যায়নি। পাহাড় চূড়ার কাছে নিজের হাতে বানানো হাইডআউট থেকে ঘাঁটিটা দেখছে রানা। ত্রিভুজের বাহু দুটো সমান, প্রতিটি তিন মাইল লম্বা। প্রস্থ, সবচেয়ে প্রশস্ত অংশে, দু'মাইলের বেশি তো কম নয়। জায়গাটা চার ভাগে ভাগ করা। ত্রিভুজের দুই বাহুর পাশে পাহাড়-প্রাচীর আর সাগর, দুটোই আছে।

ওর নীচে, ঢালের গোড়ায়, এয়ারস্ট্রিপ আর শ্রমিকদের ডেরা। পাহাড়-প্রাচীর থেকে তিনশো গজ দূরে বারো ফুট উঁচু বেড়া—চেইন-লিঙ্ক ফেন্স—মাথায় ক্ষুরের মত ধারাল তার; গোটা জমিনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

রানার চোখে বিনকিউলার রয়েছে, ভোরের ম্লান আলোয় বেড়াটাকে পাহাড় টপকে সাগরে গিয়ে মিশতে দেখা যাচ্ছে—রেজার ওয়্যার স্তূপ হয়ে আছে ওখানটায়। বেড়ার শেষপ্রান্ত ঘুরে ভিতরে ঢুকবার কোন উপায় নেই, উপায় নেই টপকাবারও।

ওর নীচে, রানওয়ের পাশে একটাই মাত্র বড়সড় হ্যাঙ্গার। হ্যাঙ্গারের পাশে ছোটখাট কয়েকটা শেড, সম্ভবত ওঅর্কশপ আর ফুয়েল স্টোর। রানওয়ের শেষ মাথার দিকে, সাগরের কাছাকাছি, কয়েকটা দালান দেখা যাচ্ছে, মেইনটেন্যান্স স্টাফ আর ক্রুদের কোয়ার্টার হতে পারে।

এয়ারফিল্ডে ঢোকা বা ওখানে থেকে বেরুনোর একটাই পথ-চেইন-লিঙ্ক ফেন্সে ইস্পাতের একটা দরজা। গেটের কাছে কোন গার্ডহাউস দেখা যাচ্ছে না। তবে এক জোড়া পোল রয়েছে, নীচে

বগি হুইল সহ–ইঙ্গিত দেয় গেটটা বিদ্যুৎচালিত, যথাযথ ব্লিপার-এর কমান্ড পেলে খোলে বা বন্ধ হয়। ভোর সাড়ে চারটের সময় এয়ার ফিল্ডের ভিতর কিছুই নড়ছে না।

এয়ারফিল্ড আর শ্রমিকদের ডেরার মাঝখানে আরেকটা বেড়া রয়েছে, সেটার মাথায়ও রেজার ওয়্যার। পরিষ্কার বোঝা যায় ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের এয়ারফিল্ডের কাছাকাছি ঘেঁষতে দেওয়া হয় না।

ঠিক পাঁচটায় ঝুলন্ত রেললাইনের টুকরোয় লোহার রড দিয়ে দশ সেকেন্ড বাড়ি মারল কেউ, সেই আওয়াজে জ্যান্ত হয়ে উঠল ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের অস্থায়ী আস্তানা। প্রথম লোকটার উপর চোখ রাখল রানা–পরনে নীল ইউনিফর্ম, পায়ে ক্যানভাসের তৈরি জুতো, একটা গরম চাদরে মাথা আর কাঁধ ঢাকা, খুদে এক ঝাঁক খুপরির একটা থেকে বেরিয়ে বারোয়ারি গোসলখানার দিকে হাঁটছে।

সবাই তারা এক জায়গায় জড়ো হতে রানা আন্দাজ করল সব মিলিয়ে তিনশো লোক হবে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জাদু ব্যবহার করে উচ্চ ফলনশীল, অতিরিক্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ ফসল আর গবাদি পশু উৎপাদন করা হচ্ছে এই ফ্যাসিলিটিতে, সে-সব কাজে শ্রম দেওয়ার জন্য এই শ্রমিকদের দরকার।

শ্রমিক কলোনির কিছু লোক খেত-খামারে বা অন্য কোথাও কাজ করতে যাবে না। তাদেরকে রানা কিচেনে রুটি বানাতে আর ডাল রান্না করতে দেখল। অনেকগুলো দোচালার নীচে লম্বা আকৃতির বেশ কিছু টেবিল ফেলা হয়েছে, আধঘণ্টা পর রেললাইনের উপর দ্বিতীয়বার বাড়ি পড়তে শ্রমিকরা যে-যার ডালভর্তি বাটি আর রুটির প্লেট নিয়ে খেতে বসল ওখানে।

তাদের আস্তানায় কোন বাগান নেই, দোকান নেই, মেয়েমানুষ বা বাচ্চা নেই, ফলে কোন স্কুলও নেই। এটা আসলে এক ধরনের লেবার ক্যাম্প। ক্যাম্পে পাকা দালান দেখা যাচ্ছে

মাত্র দুটো—গির্জা আর মসজিদ।

এয়ারফিল্ডটা যেমন পাহাড়ী ঢাল, সাগর আর তারের বেড়ার ফাঁদে আটকা পড়ে আছে, ক্যাম্পটাও তেমনি। তবে ত্রিভুজের সম বাহু দুটো যেখানে মিলিত হয়েছে, সেদিক থেকে খানাখন্দে ভর্তি একটা রাস্তা ঢুকেছে পেনিনসুলা বা উপদ্বীপের ভিতর। এরকম রাস্তা ভারী সাপ্লাই আনবার উপযোগী নয়। রানার মনে প্রশ্ন জাগল, তা হলে ভারী সাপ্লাই নিয়ে আসা হয় কীভাবে? এই যেমন, গ্যাসোলিন, ইঞ্জিন ডিজেল, এভিয়েশন ফুয়েল ইত্যাদি? দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হতে ওর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল।

ভোরের কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে ফ্যাসিলিটির তৃতীয় অংশটা—পেনিনসুলার শেষ প্রান্তে পাঁচিল ঘেরা একশো বর্গ একর জুড়ে বিভিন্ন আকৃতির দালান-কোঠা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের টপ সিক্রেট গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ওই ভবনগুলোর ভিতরই চলে। পাঁচিলটা চোদ্দো ফুট উঁচু। একটাই ইস্পাতের গেট। গেটহাউসের ভিতর কয়েকজন গার্ড ডিউটি দেয়, তাদের কাজ বোতম টিপে বিদ্যুচ্চালিত গেটটা খোলা বা বন্ধ করা। ম্যাপটা বের করে আরেকবার চোখ বুলাল রানা। ক্রস চিহ্নিত দালানটা পাঁচিলের ভিতর ঠিক কোথায়, খুঁজে নিতে বেগ পেতে হলো না। ইংরেজি হরফ এল আকৃতির দোতলা একটা বাড়ি, সাদা চুনকাম করা। ওটাই ইজরায়েলি নেভির রিসার্চ ল্যাব।

গুনে দেখল রানা, এরকম দালানের সংখ্যা মোট পঁচিশটা।

রিসার্চ ল্যাবের পিছন দিকটায় পাঁচটা একতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওগুলোয় সিনিয়র স্টাফ আর বিজ্ঞানীরা থাকে। ওদিকে একটা সিনাগগ রয়েছে।

চোদ্দো ফুটী পাঁচিলটার উপর আবার একবার চোখ বুলাল রানা। এটাও এক পাহাড়-প্রাচীর থেকে আরেক পাহাড়-প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত। পেনিনসুলার শেষ দুই প্রান্তে জমিন সাগর থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু।

পাঁচিলটার মাঝামাঝি জায়গায় পিচ ঢালা একটা রাস্তা পৌঁছেছে, ইস্পাতের প্রকান্ড গেটটা ওখানেই। গেটের ভিতর গার্ডহাউসে এই মুহূর্তে পালা বদল ঘটছে। ওটার ভিতর থেকেই গেট-ওপেনিং মেশিনারি অপারেট করা হয়।

ফ্যাসিলিটির ভিতর গার্ডদের পরনে ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত তিন রকম ইউনিফর্ম দেখতে পাচ্ছে রানা।

নেভির রিসার্চ ল্যাবের গেটেও মাত্র একজন গার্ড। গেটহাউসের সামনে তাকে পায়চারি করতে দেখে রানা আন্দাজ করল তার ডিউটিও বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে।

রানার নীচে চেইন-লিঙ্ক ফেন্স আর দু'মাইল দূরের পাঁচিলটার মাঝখানে রয়েছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের সাহায্যে ফসল ফলানোর আর গবাদি পশু উৎপাদনের খেত-খামার। খেত আর মাঠে গোলাঘর আছে, আছে গ্রিন-হাউস, মেশিনারি স্টোর, গম পেষার কল, কসাইখানা ইত্যাদি।

রানার ডান দিকে, পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায়, তবে ফার্ম-এর ভিতর, গার্ডদের জন্য ছোট একটা ব্যারাক রয়েছে। এখানেও একটা সিনাগগ দেখা যাচেছ, তবে পাকা নয়।

আর বাম দিকে, পাহাড় প্রাচীরের কিনারাতেই, এ-ও ফার্মের ভিতর,পাশাপাশি তিনটে ওয়্যারহাউস আর চকচকে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি একটা ফুয়েল স্টেশন দেখা যাচ্ছে।

পাহাড়-প্রাচীরের একেবারে ঠোঁটে বসানো হয়েছে বড় আকারের ক্রেন। ভারী সাপ্লাই এই পথেই আসে–বাক্সবন্দি হলে রশি দিয়ে টেনে তোলা হয়, তরল হলে নীচের জাহাজ থেকে সরাসরি পাম্পের সাহায্যে স্টেশন বা স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সকালের নাস্তা শেষ করল শ্রমিকরা। ঝুলিয়ে রাখা দুই ফুট রেললাইনের গায়ে আবার লোহার রড দিয়ে বাড়ি মারা হলো।

এবার কয়েক ধরনের প্রতিক্রিয়া হলো।

ডান দিকের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো ইউনিফর্ম পরা গার্ডরা। একজন তার ঠোঁট জোড়া গোল করে শিস দেওয়ার ভঙ্গি করল। রানা কিছু শুনতে পেল না, তবে খেত-খামারের দিক থেকে এক দল ডোবারম্যান পিনশারকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল—ব্যারাকের কাছাকাছি বেড়া দিয়ে ঘেরা নিজেদের কমপাউন্ডে ঢুকল ওগুলো। গুণে দেখল রানা—বারোটা। বোঝা গেল চব্বিশ ঘন্টা কিছু খায়নি; প্লেটে উঁচু হয়ে থাকা কাঁচা কলিজা আর মাংসের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবগুলো।

সূর্য ডোবার পর কী ঘটে বুঝতে পারছে রানা। স্টাফ আর শ্রমিকরা যার-যার কমপাউন্ডে ফিরে যাওয়ার পর, শিকার ধরবার জন্য ফ্যাসিলিটির ভিতর ছেড়ে দেওয়া হয় কুকুরগুলোকে। নিশ্চয় গরুর-বাছুর বা ভেড়াকে না ধরবার ট্রেনিং দেওয়া আছে। তবে কোন সিঁধেল চোর যদি ঘুরঘুর করে, তাকে আর বাঁচতে হবে না। একজন লোক বারোটা শিকারী কুকুরের সঙ্গে লড়ে জিতবে, এ হয় না। রাতে ভিতরে ঢোকা অসম্ভব।

রানা নিজেকে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর এমনভাবে ডুবিয়ে রেখেছে, নীচ থেকে কেউ পাহাড় চূড়ার দিকে তাকালেও ওকে দেখতে পাবে না।

এখানে গতকাল গভীর রাতে পৌঁছেছে ও। কীভাবে তেল আবিব শহর পিছনে ফেলে এখানে এল, মনে পড়লে এখনও গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ওর।

শাকিলাকে পথ নির্দেশ দিয়ে বিদায় করবার পর রাতের বাকি সময় মসজিদ এবং পরদিন দুপুর পৌনে একটা পর্যন্ত গির্জায় কাটাল রানা। পেটে দানা-পানি পড়েনি, জানালা-দরজার সরু ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে টের পেয়েছে ওর খোঁজে শহর চষে ফেলছে মোসাদ আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স।

গির্জায় আশ্রয় নেওয়ার আগে, মসজিদে থাকতেই, মুয়াজ্জিনের কামরা থেকে তাঁর এক সেট পরিচ্ছদ চুরি করেছে রানা, ছোট একটা কাপড়ের ব্যাগে ভরে নিয়ে এক মিনিট হেঁটে ঢুকে পড়েছে নির্জন গির্জায়। প্রার্থনাকারীদের জন্য মসজিদ, মন্দির, সিনাগগ বা গির্জার দরজা সব সময় খোলা রাখা হয়।

গির্জাটা সিটি পার্কের ঠিক উল্টোদিকে।

পার্কের ভিতর প্রথম বেঞ্চটায় বেলা ঠিক একটার সময় এক লোক এসে বসল। পাশে জোব্বা পরা রানা বসে থাকলেও একবারও ওর দিকে তাকাল না। মাথা থেকে মেক্সিকান হ্যাট খুলে মাথা চুলকাল সে। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত ভঙ্গিতে বেঞ্চ ছেড়ে গেটের দিকে হন-হন করে এগোল, যেন জরুরি কোন কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।

যাওয়ার সময় পেটমোটা ভারী রাকস্যাকটা ফেলে গেল সে।

খানিক পর রানাও উঠল, রাকস্যাক নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে আবার ঢুকল গির্জায়। ভয়ানক বিপদ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে ও, তার মধ্যে বিরাট স্বস্তিকর ব্যাপার হলো শাকিলা মেহরুন ওর বন্ধু রিকার্ডো বারকুচির নিরাপদ হাতে পৌঁছাতে পেরেছে।

ওর কী-কী দরকার, শাকিলাকে তার একটা তালিকা দিয়েছিল রানা। রাকস্যাক খুলতে দেখা গেল প্রতিটি জিনিসই পাঠানো হয়েছে। ও চায়নি, এমন দু'একটা বাড়তি জিনিসও পাঠিয়েছে বারকুচি। যেমন—সংশ্লিষ্ট এলাকার একটা ডিটেইল্ড্ ম্যাপ, কিছু শুকনো খাবার, পানির বোতল ইত্যাদি।

ওই বিস্তারিত ম্যাপটা না পেলে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ তৈরি করে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত রানার জন্য। পথ অনেকগুলোই আছে, তবে রোড ব্লক ফেলে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সারাটা দিন জঙ্গলেই কাটিয়েছে রানা। সন্ধ্যার পর পাহাড়ে

চড়তে শুরু করে। প্রায় খাড়া পাহাড়, চূড়ায় উঠতে জান বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, সময় লেগেছে পাঁচ ঘন্টা।

রাত একটার দিকে একজোড়া স্যান্ডউইচ আর কয়েক ঢোক পানি খেয়ে ঘুমাবার আয়োজন করছে রানা।

চূড়াটা সরু কারনিসের মত, দু'দিকে খাড়া ঢাল। একদিকের ঢালের ঠিক নীচে, ঝোপের ভিতর, রানার লুকানোর জায়গা। গায়ে মলম মাখল, মশা বা পোকা-মাকড় যাতে না কামড়ায়। তারপর ঘুম।

হাতঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, ঘুম ভাঙল সূর্য উঠবার ঠিক আধঘন্টা আগে–চারটে এগারো মিনিটে। মুখ, ঘাড় আর হাতে ছাই মেখে লুকানোর জায়গায় সিধে হয়ে দাঁড়াল ও। দাঁড়ালেই দেখা যাচ্ছে নীচে বিস্তৃত ইজরায়েল সরকারের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ফ্যাসিলিটি।

ছটার সময় আবার একবার ঘন্টা পড়ল, শ্রমিকদেরকে কাজে ডাকছে। উঁচু গেটের দিকে স্রোতের মত এগোল তারা। এই গেটটাই ফ্যাসিলিটিকে ক্যাম্প থেকে আলাদা করে রেখেছে।

গেটের সামনে পাঁচটা টেবিল ফেলা হয়েছে, প্রতিটিতে বসে আছে একজন করে অফিসার, পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন করে গার্ড। শ্রমিকরা দাঁড়িয়েছে পাঁচটা লাইনে।

চিৎকার করে নির্দেশ দিতে সামনে বাড়ল তারা। লাইনের প্রথম লোকটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে গলা থেকে নিজের ডগ ট্যাগ খুলে গার্ডের হাতে ধরিয়ে দিল। ট্যাগ-এর নম্বর চেক করে টেবিলে রাখা কমপিউটারের ডাটাবেসে তুলে রাখা হলো। তারপর প্রত্যেককে একটা করে স্লিপে ওঅর্ক অর্ডার দেওয়া হলো।

শ্রমিকদেরকে লাইন দিতে হবে নির্দিষ্ট কলামে, যার যার নম্বরের ধরন অনুসারে, কারণ চেকিং-এর কাজ শেষ হলে টেবিলের পিছনে দাঁড়ানো হেড গার্ডের কাছে রিপোর্ট করতে হবে

তাকে। দশ বা বিশজনের একটা করে গ্রুপ তৈরি হলে তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হবে, যাওয়ার পথে টুল শেডগুলো থেকে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট নেওয়ার জন্য থামবে একবার।

কেউ যাবে খেতে, কেউ বাগানে বা মিল-কারখানায়। রানার চোখের সামনে গোটা ফ্যাসিলিটি জ্যান্ত হয়ে উঠল। গির্জা থেকে বেরুতে দেখে এক লোককে অনেক আগেই টার্গেট করেছে ও, জিপ থেকে নেমে চোদ্দো ফুটী পাঁচিলের গেট দিয়ে তাকে 'নিষিদ্ধ' এলাকায় ঢুকতে দেখল। এরপর ছয় ফুটী দেওয়াল ঘেরা একটা দালানের দিকে এগোল সে, ঘাস কাটবার মোয়ার মেশিন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সিকিউরিটির কড়াকড়ি এতটুকু শিথিল হয়নি কোথাও। একসময় প্রায় খালি হয়ে গেল ক্যাম্প, গেটটা এখন আবার বন্ধ, শ্রমিকরাও যে-যার কাজে ছড়িয়ে পড়ল ফ্যাসিলিটির ভিতর। রানা আরও মনোযোগ দিয়ে খুঁজছে, কীভাবে চোদ্দো আর ছয় ফুটী পাঁচিল দুটোর ভিতরে ঢোকা যায়।

সকাল ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় "এল" আকৃতির বাড়িটায়, অর্থাৎ নেভির রিসার্চ ল্যাবে, গার্ডের পালাবদল ঘটতে দেখল রানা। নতুন গার্ড কোন দিক থেকে এল সেটা খেয়াল করেনি ও, তবে যে লোকটা পায়চারি করছিল তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে দেখে রাখল ঠিক কোথায় ফিরল সে। ধারণা করল নতুন গার্ডটা নিশ্চয় ওদিকের কোনও ব্যারাক থেকেই এসেছে।

বেলা এগারোটার দিকে রোদ তেতে ওঠায় শীত পালিয়ে গেল। পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় বসানো ডেরিকের কাছে একটা কর্মব্যস্ততা লক্ষ করল রানা। শক্ত-সমর্থ চার-পাঁচজন লোক অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ত্রিশ ফুটী একটা চাকা লাগানো পেট্রল বোট গড়িয়ে নিয়ে এল। একটা ল্যান্ড রোভারের পিছনে বাঁধা হলো সেটাকে। ল্যান্ড রোভার জলযানটাকে টো করে নিয়ে এল পেট্রল পাম্পে, ট্যাঙ্কে ফুয়েল ভরা হবে। বোটটিকে প্রমোদতরি

বলে চালিয়ে দেওয়া যেত, বাদ সেধেছে মাঝখানে ফিট করা থার্টি ক্যালিবারের ব্রাউনিং মেশিনগানটা।

পানিতে নামাবার জন্য তৈরি হওয়ার পর আবার টো করে একটা ডেরিকের নীচে নিয়ে আসা হলো বোটটাকে। চারটে জায়গায় লোহার চারটে চেইন পরিয়ে ক্রুসহ সেটাকে ধীরে ধীরে নিচু করে নামিয়ে দেওয়া হলো পানিতে। রানার দৃষ্টিপথ থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল সেটা।

কয়েক মিনিট পর সাগরে আবার সেটাকে দেখতে পেল রানা। বোটের ক্রুরা পানি থেকে দুটো ফিশ ট্র্যাপ আর পাঁচটা লবস্টার পট তুলে খালি করল, নতুন করে টোপ ভরল, তারপর আবার পানিতে ছুঁড়ে দিল সেগুলো।

এরপর শুরু হলো টহল।

রানা উপলব্ধি করল, এত বড় একটা ফ্যাসিলিটির সব কিছু অচল হয়ে পড়বে শুধু দু'ধরনের তরল পদার্থের অভাবে। ওগুলোর ভূমিকা এখানে মৃত সঞ্জীবনী সুধার মত।

একটা হলো গ্যাসোলিন–ওয়্যারহাউসের পিছনে বসানো জেনারেটর চালাতে লাগবে। এই জেনারেটর থেকেই আসছে ইলেকট্রিসিটি–আলোর ব্যবস্থা করা ছাড়াও প্রতিটি ইকুইপমেন্ট আর ডিভাইস অপারেট করতে সাহায্য করছে।

দ্বিতীয়টি হলো পানি–তাজা, পরিষ্কার, স্বচ্ছ পানির অপরিমিত সরবরাহ। ওটা আসছে পাহাড়ী একটা ঝরনা থেকে।

এরকম টপ সিক্রেট একটা ফ্যাসিলিটিকে স্বংয়সম্পূর্ণ করতে চাওয়ার মধ্যে একটাই যুক্তি: ফিলিস্তিনি হিউম্যান বমকে বিশ্বাস নেই। পানি, গ্যাসোলিন বা ইলেকট্রিসিটির লাইন নিশ্চয়ই তেল আবিব থেকে অনায়াসে আনা যেত। কিন্তু এত লম্বা পথ সারাক্ষণ পাহারা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন আর ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর পাহারা দিলেই বা কী, গার্ডসহ পাইপ লাইন নির্ঘাৎ উড়িয়ে দেওয়া যেত। সব দিক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এটাকে

স্বয়ংসম্পূর্ণ করেই তৈরি করতে হবে।

ঝরনাটা রানার নীচে, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে। ফ্যাসিলিটির সমতল জমিন থেকে বিশ ফুট উপরের ঢালে বেরিয়েছে ওটা, ছোটখাট পাথর ডুবিয়ে দিয়ে নেমে এসেছে একটা চ্যানেলে। চ্যানেলটার দু'পাশ কংক্রিট দিয়ে মোড়া। গোটা ফ্যাসিলিটির ভিতর এরকম আরও অনেক চ্যানেল দেখা যাচ্ছে।

স্রোতটাকে খেত-খামারে পৌঁছানোর জন্য রানওয়ে আর হ্যাঙ্গারের তলা দিয়ে যেতে হয়েছে। রানওয়ের নীচ দিয়ে ঢুকে অপরদিক দিয়ে বেরিয়েছে ওটা, তারপর চেইন-লিঙ্ক ফেন্সের তলা দিয়ে এগিয়েছে। রানা প্রায় নিশ্চিত , ওখানটায় দুর্ভেদ্য গ্রিল না থেকেই পারে না। গ্রিল না থাকলে এয়ারফিল্ডের ভিতর থেকে যে-কারও পক্ষে স্রোতটায় নেমে পড়া সম্ভব। রেজার ওয়্যারের নীচ দিয়ে ফ্যাসিলিটির ভিতর তো ঢোকা যাবেই, চ্যানেলের দ্রুতগতি পানিকে ব্যবহার করে ফাঁকি দেওয়া যাবে কুকুরগুলোকেও। যে-ই এই ডিফেন্স সিস্টেমের ডিজাইন করে থাকুক, এ রকম একটা সুযোগ সে রাখবে না।

বেলা আরেকটু বাড়তে হ্যাঙ্গার থেকে টো করে একটা হকার-১০০০ বের করা হলো। রানা ধারণা করল, কেউ বোধহয় কোথাও যাবে। তবে না, প্লেনটাকে বের করা হয়েছে হ্যাঙ্গারের ভিতর জায়গা করবার জন্য। কেউ এসেছে বা আসছে।

একটু পরই শহরের দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার উড়ে এল। এ-ধরনের কপ্টার আগেও দেখেছে রানা, সাধারণত মনিটরের কাজে পুলিশ ব্যবহার করে। প্রয়োজন হলে পাথুরে পাঁচিল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপরে শূন্যে স্থির হয়ে থাকতে পারে এগুলো।

ঝোপের ভিতর বসে পড়তে হলো রানাকে। তবে না, কপ্টারটা উপরে উঠল না। হ্যাঙ্গারের মুখের সামনে নামল ওটা, ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কর্নেল জারকা। সঙ্গে আরেকজন লোক

রয়েছে, তার পরনেও কর্নেলের ইউনিফর্ম।

হ্যাঙ্গারের ভিতর থেকে একটা জিপ নিয়ে বেরিয়ে এল মেজর ল্যাঙ্কি। পিছনের সিটে দুই কর্নেলকে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। গন্তব্য অফিসার্স কোয়ার্টার। কপ্টারটাকে হ্যাঙ্গারের ভিতর টো করে নিয়ে যাওয়া হলো। ওটার ইঞ্জিন সম্ভবত সার্ভিসিং করা হবে।

সকাল ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত কাজ করানোর পর শ্রমিকদের ছায়ায় ফিরে বিশ্রাম নিতে দেওয়া হলো। ক্যানভাসের ব্যাগে করে খাবারদাবার যাই নিয়ে আসুক, খেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। ঘন্টা বাজিয়ে আবার তাদের জাগানো হলো তিনটের সময়। আরও তিন ঘন্টা শ্রম দিতে হবে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টাফ আর বিজ্ঞানীরা ডিউটিতে আসে সকাল দশটায়। অফিস করে পাঁচটা পর্যন্ত।

শ্রমিকরা যে-যার কাজে ফিরে গেছে, এই সময় পাহাড়ের মাথা থেকে বাম দিকে একটা তোবড়ানো পিকআপ দেখতে পেল রানা। একজোড়া ডেরিকের মাঝখানে এসে থামল, সাগরের দিকে পিছন ফিরে। রক্ত মাখা ওভারঅল পরা একজন শ্রমিক পিকআপের পিছন থেকে ইস্পাতের তৈরি একটা চোঙ নামিয়ে টেইল গেটে আটকাল, তারপর পিচফর্ক-এর সাহায্যে ইস্পাতের স্লাইডে কী যেন তুলতে শুরু করল। জিনিসটা যাই হোক, পিছলে সাগরে পড়ে যাচ্ছে। বিনোকিউলারের ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল রানা। ফর্কটা আবার ভরা হতে ফাঁস হয়ে গেল গুমর।

কালো একটা মস্ত ষাঁড়ের চামড়া, মাথাটা এখনও ওটার সঙ্গে ঝুলে আছে।

এর অর্থ হলো, গোটা পেনিনসুলার তিন পাশে সাগরের পানিতে হ্যামারহেড, টাইগার আর গ্রেট হোয়াইট শার্ক ঝাঁক বেঁধে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আলসেমিতে পাওয়া গোধূলি এবং সন্ধ্যা হিম ঠান্ডা বয়ে নিয়ে

এল। জ্যাকেটের উপর একটা কোট চাপাল রানা। ঢালের নীচে খিস্টান আর মসুলমান শ্রমিকদের ফিরে আসতে দেখছে ও। ক্লান্ত পা টেনে টেনে হাঁটছে তারা। যন্ত্রপাতি টুলশেডে রেখে আসতে হচ্ছে। তারপর এক এক করে সবাইকে গেটের ভিতর ঢোকানোর কাজ শুরু হলো—সকালের মতই পাঁচ লাইনে দাঁড়িয়েছে তারা, প্রতি লাইনে পঞ্চাশজন করে। এই আড়াইশোজনই কাজে গিয়েছিল।

ক্যাম্পে ফিরে এল তারা। চারদিকে আলো জ্বলে উঠল। খুব কম লোকই মসজিদ বা গির্জার দিকে গেল। মুয়াজ্জিন নিশ্চয় কোথাও থেকে আজান দিয়েছে, তবে রানা তা শুনতে পায়নি। ও অবশ্য আজান বা মসজিদের ব্যাপারে তেমন মনোযোগীও নয়, ওর চোখ পড়ে আছে গির্জার দিকে।

একটু পর পরই ফিরে আসছে চোখ "এল" আকৃতির সাদা দালানটার উপর।

ওই দালানের গেটে, গেটহাউসের বাইরে, একজন গার্ড বসে রয়েছে। পালা বদলের সময় তার কাছে এক গোছা চাবি দেখেছে রানা, সেটা সে তার সঙ্গীর হাতে তুলে দিয়েছে। অন্যান্য দালানের মত নেভির এই দালানটাও ছয় ফুটী পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটটা ওই পাঁচিলের মাঝখানে।

বারো

পাহাড়-চূড়ার একটু নীচে, ঝোপের ভিতর নিজ হাতে তৈরি লুকানোর জায়গা থেকে, দ্বিতীয়বার সূর্যটাকে ডুবতে দেখছে

রানা। এখানে এটাই ওর শেষ রাত।

ওর নীচে পেনিনসুলায় সব আলো নিভে গেল। এবার রানা ফ্যাসিলিটিতে নামবার জন্য প্রস্তুতি নেবে। শ্রমিকরা খুব ভোরে ওঠে, ফলে শোয়ও তাড়াতাড়ি।

রাকস্যাকে অল্প খাবারই অবশিষ্ট আছে, খেয়ে ফেলল সবটুকু। ছোট একটা ব্যাকপ্যাক ছিল রাকস্যাকের ভিতরে, তাতে দু'দিন চলবার মত ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার আর চিনি ভরল। পানি খেয়ে শেষ বোতলটাও খালি করে ফেলল, শরীরে আগামী চব্বিশ ঘন্টার জন্য একটা রেয্যারভোয়ার তৈরি করা হলো।

নীচে নামবার পর কুন্ডলী পাকানো রশিটাকেই শুধু ভারী বোঝা বলে মনে হবে। কেউ কোন দিন খুঁজে পাবে না, এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে ওটাকে।

অস্থায়ী আস্তানাটা গুটিয়ে ফেলল রানা, চেষ্টা করল সহজে ওটা যাতে কারও নজরে না পড়ে। প্রস্তুতি শেষ, তারপরও কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করল রানা। প্রতিটি কাজ সময়ের একটা হিসাব ধরে করতে চাইছে ও।

রওনা হলো মাঝরাতের খানিক পর।

একটা পর্যায় পর্যন্ত পাহাড়টা তেমন খাড়া নয়, পিটন বা রশির সাহায্য ছাড়াই নামা গেল। নামতে শুরু করে রানা খেয়াল করল, সমস্ত গাছ আর ঝোপ ন্যাড়া হয়ে আছে। এতে প্রকৃতির কোন হাত নেই, কাজটা মনুষের।

প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল এমন একজন লোক একদল শ্রমিককে নিয়ে পাহাড়-চূড়ার কাছাকাছি উঠে আসে, তারপর প্রতিটি গাছ আর ঝোপের পাতা সহ সমস্ত সরু ডাল কাটিয়ে সাফ করে ফেলে। কারণটা পরিষ্কার–কেউ যাতে পাহাড়ের ঢালে গা ঢাকা দিতে না পারে।

গাছ যেখানে যথেষ্ট সরু, হ্যাঁচকা টান দিয়ে শিকড় সহ উপড়ে

ফেলা হয়েছে। রশির তৈরি ঝুলন্ত মইয়ের ধাপে বসে যে-সব গাছ উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি, সেগুলোকে কেটে ছোট করে ফেলা হয়েছে। তবে এভাবে কত ছোটই বা করা যায়। অবশিষ্ট যা রয়ে গেছে সেগুলোয় অনায়াসে পা রাখবার কাজ চলছে রানার। এমনকী হাত দিয়ে ধরে ঝুলে থাকাও যাচ্ছে।

দিনের আলোয় এভাবে কেউ নামতে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে কারও না কারও চোখে পড়ে যাবে। তবে রাতে নয়।

কুন্ডলী পাকানো রশিটা দরকার হলো ঢালটা শেষ হতে একশো ফুট বাকি থাকতে। এই একশো ফুট একদম খাড়া।

চূড়া থেকে সরাসরি নয়, তির্যক একটা রেখা ধরে ডান দিক ঘেঁষে নেমেছে রানা, ফলে এয়ারফিল্ডের বদলে ওর সরাসরি নীচে এখন লেবারদের ক্যাম্পটা চলে এসেছে। আধমাইল বেশি দূরত্ব পেরুতে হলো ওকে, একঘন্টা সময়ও বেশি লাগল। তবে সময়ের হিসাবটা ঠিক আছে ওর। আকাশের এক কোণে কাস্তে আকৃতির ঘোলাটে চাঁদ উঠল। শীতের রাত, তা সত্ত্বেও ঘামে ভিজে গেছে ওর কাপড়চোপড়।

অবশিষ্ট খাড়া একশো ফুটের মাথায়, একটা গাছের গুঁড়িতে লুপ পরাল রানা। বাকি রশি ঝুলিয়ে দিল নীচে। অ্যাথলেটিক লাফ-ঝাঁপ এড়িয়ে স্রেফ পিছু হটছে, এক পা এক পা করে, ফলে নুড়ি পাথর গড়ানোর ঝুঁকি থাকছে না। এভাবে পাহাড়-প্রাচীর আর গির্জার মাঝখানে পৌঁছাল ও।

গির্জার এটা পিছন দিক। রানা আশা করল মরার মত ঘুমাবে প্রিস্ট; তার বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে ও। জোড়া রশির একটা ধরে ধীরে ধীরে টানছে। একশো ফুট উপরের গাছের গুঁড়ি থেকে বাকি রশি ঝুপ করে নেমে এল। কুন্ডলী পাকিয়ে বোঝাটা আবার কাঁধে ঝোলাল, তারপর বেরিয়ে এল গির্জার ছায়া থেকে।

মল-মূত্র ত্যাগের আয়োজন এজমালি, লেবার ক্যাম্পে কোন

মেয়ে না থাকায় তাদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা করতে হয়নি। উপর থেকে লোকজনকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতে দেখেছে রানা। ল্যাট্রিন বলতে লম্বা একটা ট্রেঞ্চ , দুর্গন্ধ ঠেকানোর জন্য মাথায় বোর্ড ফেলা আছে। সেই বোর্ডে দু'হাত পর পর একটা করে গোল গর্ত , ঢাকনি সহ। প্রতিটি গর্ত চারপ্রস্থ বোর্ড দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে একটা হলো দরজা।

এরকম একটা দরজা খুলে দম আটকাল রানা, গর্তের উপর থেকে ঢাকনাটা তুলল, কাঁধ থেকে নামিয়ে অন্ধকার গর্তের ভিতর ফেলে দিল কুন্ডলী পাকানো রশি আর অপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সহ রাকস্যাকটা। ভাগ্য ভাল হলে এ-সব চিরকালের জন্য গায়েব হয়ে যাবে।

শ্রমিকরা সার বাঁধা খুপরিতে শোয়, প্রতিটিতে একজন করে। এক লাইনে দশটা করে খুপরি, মুখোমুখি আরও দশটা, ফলে দুই সারির মাঝখানে তৈরি হলো একটা গলি। গলিগুলো প্রধান সড়ক থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে। ওদিকটা আবাসিক এলাকা।

মূল সড়ক চলে এসেছে চৌরাস্তায়, চারপাশে দেখা যাচ্ছে হাত-মুখ ধোয়ার জন্য পানির কল, কিচেন, ধোপাখানা, খাবার টেবিল ইত্যাদি।

চাঁদের আলো এড়িয়ে গির্জার কাছে ফিরে এল রানা। মূল দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে, তবে দু'মিনিটের বেশি সেটা ওকে আটকে রাখতে পারল না।

গির্জার ভিতর তেমন কিছু থাকে না, এটাতেও নেই। রানা যা খুঁজছে তা পাওয়া গেল একদম পিছনদিকে, ভেসট্রিতে—যেখানে প্রিস্টদের বিশেষ পোশাক-আশাক রাখা হয়। মূল দরজার তালা খোলা রেখেই খুপরিগুলোর কাছে ফিরে এল ও। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটনির পর নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে শ্রমিকরা।

পাহাড়ের মাথায় থাকতেই নির্দিষ্ট একটা ক্যাবিনের অবস্থান মনে গেঁথে রেখেছে রানা। লোকটাকে সকালে খুপরি থেকে

বেরিয়ে টেবিলে বসে নাস্তা খেতে দেখেছে, সন্ধ্যায় দেখেছে কাজ থেকে ফিরে প্রার্থনার জন্য গির্জায় ঢুকতে। তার খুপরিটা মূল সড়ক থেকে তিনটে গলির পর। বাঁ দিকে, পাঁচ নম্বর।

খুপরিতে তালা মারবার কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু কাঠের একটা হুড়কো। নিঃশব্দে ভিতর ঢুকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল রানা, অন্ধকারটা সইয়ে নিচ্ছে চোখে।

দ হয়ে শুয়ে থাকা লোকটার নাক ডাকার কোন বিরতি নেই। তিন মিনিট পর অন্ধকারেও লোকটাকে প্রায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। কর্কশ একটা কম্বলের নীচে কাঠামোটা স্পষ্ট। একটু ঝুঁকে পিঠে আটকানো ব্যাকপ্যাক থেকে কিছু বের করল ও, তারপর বিছানার দিকে এগোল। ওর হাতের ভেজা প্যাড থেকে ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধ উঠে এল নাকে।

একবার গোঙাল লোকটা, কয়েক সেকেন্ড এ-পাশ ও-পাশ করল,তারপর তলিয়ে গেল আরও গভীর ঘুমে। প্যাডটা তারপরও চেপে ধরে রাখল রানা, যাতে অন্তত কয়েক ঘন্টা জ্ঞান না ফেরে। তারপর লোকটাকে তুলে কাঁধে ফেলল, খুপরি থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটছে গির্জার দিকে।

গির্জায় ঢুকবার মুখে থামল রানা, কান পেতে অপেক্ষা করছে, নিশ্চিত হতে চায় কারও ঘুম ভাঙিয়েছে কিনা। না, গোটা ক্যাম্প স্থির, ঝিম মেরে আছে।

ভেসট্রিতে ফিরে এসে চওড়া মাস্কিং টেপ দিয়ে লোকটার দুই গোড়ালি আর দুই হাত বাঁধল রানা। তারপর নাকের ফুটো বাদ দিয়ে মুখেও টেপ লাগাল।

বাইরে বেরিয়ে এসে এবার গির্জার দরজায় তালা দিল ও। তারপর ফিরে এল লোকটার খুপরিতে। ঝুঁকি নিয়ে পেন্সিল টর্চটা জ্বালতে হলো। শ্রমিক লোকটার এই অস্থায়ী ঠিকানায় সম্পদ বলতে কিছু নেই। ভার্জিন মেরির একটা পোর্ট্রেইট টাঙানো রয়েছে একদিকের দেয়ালে। আরেক দেয়ালে ঝুলছে

একটা বাঁধানো ফটো, হাসিতে উদ্ভাসিত এক তরুণী। প্রেমিকা, বোন, নাকি মেয়ে? চোখে বিনকিউলার নিয়ে দেখবার সময় লোকটাকে রানার সম-বয়সী বলে মনে হয়েছিল, তবে আরও ছোট হতে পারে সে। এখানে যারা গাধার খাটনি খাটতে আসে তাদের বয়স খুব দ্রুত বাড়ে। অবশ্য দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দু'জন প্রায় সমানই, সেজন্যই তাকে বেছে নিয়েছে রানা।

দেয়ালে সাজাবার মত আর কিছু নেই, একজোড়া পেরেক ছাড়া। ওগুলোয় একই মাপের দুই জোড়া ইউনিফর্ম ঝুলছে—কর্কশ সুতি কাপড়ের নীল ট্রাউজার, একই কাপড়ের শার্ট। রশির সোল সহ দুই জোড়া ক্যানভাস শু্য রয়েছে মেঝেতে। পুরানো, তবে মজবুত। এরপর একটা ক্যানভাস ব্যাগ আর একটা কালো গরম চাদর পেল রানা। কাজে বেরুবার সময় ব্যাগটায় ভরা হয় দুপুরের খাবার। আর চাদরটা শীত ঠেকাবার জন্য। পেন্সিল টর্চ নিভিয়ে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা। চারটে বেজে পাঁচ মিনিট।

যে-সব জিনিস সঙ্গে নেবে সেগুলো ঘামে ভেজা শার্টে জড়িয়ে ক্যানভাস ব্যাগে ভরল রানা। বাকি সব লুকিয়ে রেখে যাবে, তাই ব্যাকপ্যাকে ভরে ফেলে দিয়ে এল ল্যাট্রিনে। এরপর অপেক্ষা, কখন ঝুলে থাকা রেলওয়ে লাইনে লোহার ডাণ্ডা পড়ে।

সেটা পড়ল পাঁচটার সময়, পুবদিকের আকাশ সবে মাত্র রাঙা হতে শুরু করেছে। ওই ঘন্টার উৎস হলো ডিউটি গার্ড, দাঁড়িয়ে আছে ক্যাম্পের বাইরে, চেইন-লিঙ্ক স্টীল গেটের ঠিক সামনে। ওই গেটটাই টপ সিক্রেট ফ্যাসিলিটিতে ঢুকবার একমাত্র পথ। ওটা পেরুতে পারলে বাকি কাজ রানার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে, কারণ দিনের বেলা ফ্যাসিলিটির ভিতর টহলরত কোন গার্ড থাকে না। ভিতরে রাতেও কোন টহল গার্ড থাকে না, শুধু বারোটা ডোবারম্যান।

ঘন্টা পড়া মাত্র রানার চারপাশে জ্যান্ত হয়ে উঠল গোটা

ক্যাম্প। সবাই ল্যাট্রিনের দিকে ছুটছে, সেখান থেকে মুখ ধুতে যাচ্ছে কলে। নিজের খুপরি ছেড়ে রানা বেরুচ্ছে না, ভাবছে কেউ খেয়াল করবে না। বিশ মিনিট পর দরজার কবাট একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাল। ওর গলিটা আবার ফাঁকা হয়ে গেছে। চিবুক নিচু করা, গরম কালো চাদর দিয়ে মাথা আর কাঁধ ঢাকা, ল্যাট্রিনের দিকে রওনা হলো এতক্ষণে—একই রঙের প্যান্ট, শার্ট আর ক্যানভাস শ্যু পরা আড়াইশো লোকের মধ্যে একজন।

খোলা গর্তের উপর উবু হয়ে বসে থাকল রানা, ওদিকে বাকি সবাই টেবিলে বসে নাস্তা সারছে। তারপর তৃতীয় ঘন্টা পড়ল। ছয়টা বাজে। এর অর্থ হলো, শ্রমিকরা এখন ফ্যাসিলিটিতে ঢুকবার জন্য ইস্পাতের গেটের সামনে লাইন দেবে।

লাইন তৈরি হচ্ছে, ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়ে এসে তার একটায় দাঁড়াল রানা।

পাঁচজন চেকার যার যার টেবিলে বসে ডগ ট্যাগ পরীক্ষা করছে, চোখ বুলচ্ছে ওঅর্ক ম্যানিফেস্ট-এ, বোতাম টিপে কমপিউটারে রেকর্ড রাখছে আজ সকালে কত শ্রমিককে ফ্যাসিলিটির নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হলো, কোন্ গ্রুপের সঙ্গে কাজ করবে সে। এরপর প্রত্যেককে একটা করে ওঅর্ক অর্ডার স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে হাত নেড়ে সামনে এগোতে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট শ্রমিক চলে যাচ্ছে গ্যাঙ মাস্টারের কাছে। গ্যাঙ মাস্টার তার দলের সবাইকে নিয়ে রওনা হচ্ছে টুলশেডের দিকে। ওখান থেকে সাইকেল আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে যে যার কাজে চলে যাবে।

রানার লাইন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। এক সময় টেবিলের সামনে পৌঁছাল ও। দু'আঙুলে ধরে ডগ ট্যাগটা বাড়িয়ে ধরল অফিসারের দিকে, সবাইকে যেভাবে করতে দেখেছে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে খুক-খুক করে দু'তিনবার কাশল। ইহুদি অফিসার ঝট করে সরিয়ে নিল মুখটা, কোন রকমে ট্যাগ নম্বরটা

ডাটাবেসে তুলল, তারপর হাত নেড়ে বিদায় করে দিল ওকে। শুকনো মরিচের গন্ধ একদমই সহ্য হয় না তার। নতুন শ্রমিক টুল শেড থেকে লন মোয়ার সংগ্রহ করবার জন্য ছুটল; তাকে 'নিষিদ্ধ এলাকা'র লম্বা ঘাস কাটবার কাজ দেওয়া হয়েছে।

চেইন-লিঙ্ক ফেন্স,অর্থাৎ ফ্যাসিলিটির মূল অংশে ঢুকবার পর, খেতে-খামারে ছড়িয়ে পড়ল শ্রমিকরা। রাস্তার পাশেই আপেল আর আঙুর খেত, ঝুড়ি আর মই নিয়ে ভিতরে ঢুকল একদল শ্রমিক। আরেক দল চলে গেল কালভার্টের উপর দিয়ে গম খেতের দিকে। সবজি খেতটা রাস্তার আরেক পাশে, ভিতরে ঢুকে এরইমধ্যে একদল লোক কাজ শুরু করে দিয়েছে সেখানে। এখানে এ-সব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে ফলানো হচেছ।

একটা খেজুর বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই বিদ্যার জাদু চোখে পড়ল রানার–একেকটা খেজুর আকারে বড় সাইজের নারকেলি বরইয়ের সমান।

সবুজ ঘাস মাড়িয়ে শ্রমিকদের আরেক দলকে দেখা গেল গোয়াল-ঘরের দিকে এগোচেছ।

তেরো

সকাল ছ'টায় ফ্যাসিলিটির ভিতর নিজের বাংলোর টেরেসে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছে কর্নেল জারকা–আঙুর, আপেল, ডিমভাজা, টোস্ট, আর কফি। সাড়ে ছ'টায় পাশের বাংলো থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এল কর্নেল হেজাজের রিপ্লেসমেন্ট কর্নেল

এজরা বেনুন।

'আপনাকে সব আমি ঘুরিয়ে দেখাব,' বলল জারকা। 'তা হলেই বুঝতে পারবেন ওই শালা মাসুদ রানার বাপেরও সাধ্য নেই যে এখানে ঢোকে।'

'চলুন, আগে দেখি। না দেখে আমি কোন মন্তব্য করতে রাজি নই,' বলল বেনুন। 'আচ্ছা, মেয়ে স্পাইটা? আমরা কী ধরে নেব আপনাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে সে?'

মাথা নাড়ল জারকা। 'যে জাল বিছিয়েছি, তেল আবিব থেকে পালাবার কোন উপায় নেই তার। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া?'

'আমি বলেছি রানা এখানে ঢুকতে পারবে না। এ-কথা কি বলেছি যে ঢুকতে সে চেষ্টা করবে না?'

'চেষ্টা করবে?'

'অবশ্যই! এ কি কাউকে বলে দিতে হয় যে এই রিসার্চ ল্যাবটা ধ্বংস করার জন্যেই তেল আবিবে এসেছে সে? এখানে ঢুকতে চেষ্টা করুক, তখনই তার মাংস থেকে চামড়া আর হাড় থেকে মাংস খুলে নেয়া হবে। বাপ-বাপ করে বলে দেবে কোথায় আছে শাকিলা।'

সাতটায় বেনুনকে নিয়ে খোলা একটা জিপে উঠে বসল জারকা। 'বলুন, প্রথমে আপনি কী দেখতে চান।'

'প্রথমে অবশ্যই নেভির রিসার্চ ল্যাবটা দেখতে চাই,' বলল কর্নেল বেনুন। 'ওখানকার সিকিউরিটি সিস্টেমটা কী রকম জানা দরকার।'

'এখানেই এই ফ্যাসিলিটির বৈশিষ্ট্য।' হেসে উঠে বলল জারকা। 'ওখানকার সিকিউরিটি সিস্টেম বলতে আদৌ কিচ্ছু নেই। কেন নেই, বলছি। এই ফ্যাসিলিটির ভেতর, "নিষিদ্ধ এলাকা"য়, পঁচিশটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের ল্যাক্ষে গোপন রিসার্চ বা এক্সপেরিমেন্ট চলছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধে

সহ একটা করে দালান বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দালানগুলোর প্রতিটির জন্যে একজন করে গার্ড আছে, ব্যস, আর কিছু না...'

'কেন?' কর্নেল বেনুন বিস্মিত।

'দরকার নেই, তাই,' বলল জারকা। 'প্রথমত ফ্যাসিলিটিতে ঢুকতে হলে রেজার ওয়্যার লাগানো বেড়াটা টপকাতে হবে। আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি। তারপর নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে হলে চোদ্দো ফুট উঁচু একটা পাঁচিল টপকাতে হবে। এ-ও অসম্ভব, কারণ এই পাঁচিলের মাথাতেও রেজার ওয়্যার আছে।'

'আমরা কীভাবে ঢুকব? বিজ্ঞানীরা কীভাবে ঢোকেন?'

'প্রতিটি দালানের গেটহাউসে চাবি নিয়ে বসে আছে একজন করে গার্ড—একটু আগে যার কথা বললাম। ট্যাগ আর ওঅর্ক-অর্ডার দেখালে গেট খুলে দেবে সে। এভাবে কমপাউন্ডে ঢোকা যাবে। দালানের ভিতর ঢুকতে হলে স্পেশাল পাস দেখাতে হবে।'

'হুম।' বোঝা গেল কর্নেল বেনুন খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। 'আমরা তা হলে একদম শেষে রিসার্চ ল্যাবটা দেখতে যাব?'

'হ্যাঁ,' বলে জিপ ছেড়ে দিল কর্নেল জারকা।

বেনুনের কথায় রাজি হয়ে সে যদি এখন নেভির রিসার্চ ল্যাবে যেত, ভয়ানক বিপদেই পড়ত রানা। গোপন ল্যাবে তৈরি ক্লোন এবং মেকানিক্যাল কয়েকটা সাবজেক্টের সঙ্গে এই মুহূর্তে খুনসুটি করছে ও।

'প্রথমে তা হলে সাগরের দিকটা দেখান আমাকে,' জারকাকে বলল বেনুন। 'শুনেছি আপনার ওই মাসুদ রানা আক্সিজেন বটল আর ফ্লিপার পেলে ডুব সাঁতার দিয়ে আটলান্টিকও নাকি পাড়ি দিতে পারে।'

'তা হলেই বুঝে দেখুন, ওই ব্যাটা সম্পর্কে কী রকম অবাস্তব সব গুজব ছড়ানো হয়েছে!'

গতি বাড়িয়ে একটা পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায় এসে জিপ থামাল জারকা। 'এখান থেকেই দেখুন,' গাড়ি থেকে নামবার সময় বলল সে। 'গোটা ফ্যাসিলিটিকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে সাগর। শুধু সাগর নয়, পাহাড়-প্রাচীরও–সেই প্রাচীর সবচেয়ে নিচু অংশেও বিশ ফুট উঁচু। কোথাও কোথাও এমনকী চারশো ফুটও, তবে বেশিরভাগ জায়গায় পঞ্চাশ ফুট।'

'নিশ্চয়ই শুধু প্রকৃতির সার্ভিস নেয়া হচ্ছে না?'

'আরে, না! সি-স্ক্যানিং রেডার আছে না! টিভি ডিশের ছদ্ম-বেশ পরানো হয়েছে ওগুলোয়। সাগর পথে কেউ বা কিছু এলেই সাবধান করে দেবে আমাদেরকে।'

'প্রতিরোধ?'

'এক জোড়া দ্রুতগতি পেট্রল বোট। একটা সব সময় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ফ্যাসিলিটির তিনদিকের পানি একশো মাইল পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা। শুধু মাঝে-মধ্যে ডেলিভারি ফ্রেইটারকে আসতে দেয়া হয়।'

খুক করে কাশল কর্নেল বেনুন। 'আমি আন্ডারওয়াটার এন্ট্রি সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম।'

'আপনি বিশেষ একজনের কথা বলতে চাইছেন? ঠিক আছে, দেখুন কী ঘটতে পারে।' কোমরের বেল্ট থেকে খুলে ওয়াকি-টকি অন করল কর্নেল জারকা, রেডিও অপারেটরের মাধ্যমে লাইন পেয়ে কথা বলল কসাইখানার ইনচার্জের সঙ্গে।

প্রদর্শনীর আয়োজনটা করা হলো ডেরিকের কাছাকাছি। কর্নেল বেনুন বালতি ভর্তি পশুর চামড়া পিছলে যেতে দেখল, তারপর সেটা খসে পড়ল ত্রিশ ফুট নীচের সাগরে।

কয়েক সেকেন্ড কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তারপর প্রথমে ম্যাশিটির মত একটা ফিন চিরে দিল পানিকে। ষাট সেকেন্ডের মধ্যে ক্ষুধার্ত হাঙরদের যে রক্তাক্ত ভোজন উৎসব শুরু হয়ে গেল, সেটাকে উন্মত্ততা না বলে উপায় নেই।

‘এখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন খুব ভালো,’ বলল জারকা। ‘বুঝতেই পারছেন , প্রচুর পশু জবাই করা হয়।’

‘তো?’

‘যখনই কোন পশু জবাই হয়, তার তাজা চামড়া আর রক্ত ফেলে দেয়া হয় সাগরে। কাছাকাছি পানিতে গিজ-গিজ করতে থাকে হাঙর–ব্ল্যাকটিপ, হোয়াইটফিন, টাইগার, জায়ান্ট হ্যামারহেড–সব জাতেরই পাবেন আপনি। গত মাসে আমার এক লোক বোট থেকে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তোলার জন্য ফিরে যায় বোট। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যায় ওরা। তবে তাতেও দেরি হয়ে গেল।’

‘পানি থেকে তাকে তোলা গেল না?’

‘তার বেশিরভাগটাই তোলা গেছে। শুধু পা দুটো গায়েব। লোকটা দু’দিন পর মারা যায়।’

‘কবর?’ চোখ সরু করে জানতে চাইল মোসাদ অফিসার।

হাত তুলে দেখাল জারকা। ‘আর কী! ওখানেই।’

‘তারমানে শেষ পর্যন্ত তাকে হাঙরের পেটেই যেতে হলো।’

‘এখানে কেউ ভুল করতে পারবে না। অন্তত আমি যতক্ষণ দায়িত্বে আছি।’

‘পাহাড় টপকে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা কতটুকু?’ জানতে চাইল বেনুন।

জবাবে তার হাতে একজোড়া ফিল্ড গ্লাস ধরিয়ে দিল জারকা। ‘নিজেই দেখুন। চূড়া এত সরু, রীতিমত ধারাল বলতে হবে। পানিতে বা পানির কাছাকাছি নেমে আসা ঢাল একদম খাড়া। দিনের বেলা ঢাল বেয়ে কেউ নামতে শুরু করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেখা যাবে তাকে।’

‘কিন্তু রাতে?’

‘বেশ, পাহাড়ের গোড়ায় আপনি নামতে পারলেন। তারপরও আপনি রেজার ওয়্যারের বাইরে। “নিষিদ্ধ এলাকা” থেকে

দু'মাইলেরও বেশি দূরে। চোদ্দ ফুট পাঁচিলের বাইরে, ছয় ফুটী পাঁচিলেরও বাইরে। আপনি শ্রমিক নন, নন গার্ডও, কাজেই খুব তাড়াতাড়ি কারও না কারও চোখে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য। আর ধরা পড়লে ব্যবস্থা নিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে।'

'ঝরনা সম্পর্কে বলুন। ওটার স্রোতকে তো আমি বোধহয় গোটা ফ্যাসিলিটিতেই বয়ে যেতে দেখছি।'

'হ্যাঁ, যেখানে পারা গেছে সেখানেই নালা তৈরি করে স্রোতটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আসুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।'

জিপ চালিয়ে এয়ারফিল্ডের দিকে রওনা হলো জারকা। নিজের স্লিপার ব্যবহার করে চেইন-লিঙ্ক গেট খুলল সে। জিপ নিয়ে চলে এল পাহাড় থেকে নেমে আসা স্রোত যেখানে রানওয়ের নীচে ঢুকেছে।

জিপ থেকে নামল ওরা। রানওয়ে আর ফেন্স-এর মাঝখানে আকাশের দিকে অনেকটাই উন্মুক্ত ঝরনার পানি। স্বচ্ছ পানি তলার ঘাস আর আগাছার উপর দিয়ে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে।

'কিছু দেখছেন?'

'নাহ্,' বলল বেনুন।

'ঠান্ডায় রয়েছে ওরা, ছায়ায়, রানওয়ের নীচে।'

টুকরোটা নিশ্চয়ই কাল রাতের বারবিকিউ-এর অংশ, আজ সকালের কথা ভেবে জিপে রেখে দিয়েছিল জারকা। সেটা ছুঁড়ে দিতেই ফুটতে শুরু করল পানি। কর্নেল বেনুন দেখল রানওয়ের নীচ থেকে চোখের পলকে ছুটে এল একঝাঁক পিরানহা। সিগারেটের প্যাকেট আকৃতির মাংসের টুকরোটা সুচের মত তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে।

নালা কেটে স্রোতটাকে নানাদিকে নিয়ে যাওয়া হলেও, শেষ পর্যন্ত সাগরে পড়বার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। জিপ চালিয়ে সেখানেও বেনুনকে নিয়ে এল জারকা।

‘সাগরে পড়ার আগে, স্রোতের নীচে লোহার স্পাইক পুঁতে রাখা হয়েছে,’ বলল সে। ‘কেউ যদি নালা দিয়ে সাগরে পালাবার চেষ্টা করে, ওই স্পাইকগুলো রক্তাক্ত করবে তাকে। তারপর কী? হাঙর।’

‘কিন্তু রাতে?’

‘ওহ্, কেন, কুকুরগুলোকে আপনি দেখেননি? বারোটার একটা পাল। ডোবারম্যান পিনশার মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। ওদেরকে শ্রমিক আর গার্ডদের ইউনির্ফর্ম না ছোঁয়ার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানী আর অফিসাররা ঘর থেকে বাইরে বেরুবার আগে সবাই একটা বিশেষ সেন্ট মাখেন, কুকুরগুলো ওই ঘ্রাণ চেনে, ফলে কিছু বলে না।

‘ওগুলোকে ছাড়া হয় সূর্যাস্তের পর। সেই মুহূর্ত থেকে প্রতিটি শ্রমিক, প্রতিটি আগন্তুককে ওয়্যার-এর বাইরে থাকতে হবে, তা না হলে প্রাণ হারাতে হবে কুকুরের আক্রমণে। এবার বলুন, রানাকে ভয় পাবার আসলে কি কোন কারণ আছে?’

মাথা নাড়ল কর্নেল বেনুন। ‘এদিকে যদি এসেও থাকে, এতক্ষণে পালিয়েছে।’

গলা ছেড়ে হেসে উঠল জারকা। ‘তা হলে তো আবার অসুবিধে,’ হাসি থমিয়ে বলল সে। ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শাকিলাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না পারলে মরেও শান্তি পাব না আমি।’ হাতঘড়ি দেখল সে। ‘আশ্চর্য, আমার এটা ঘড়ি না ঘোড়া? এরইমধ্যে ন’টা বাজতে চলেছে!’

বেনুনও নিজের হাতঘড়িতে চোখ বুলাল। ‘তাতে কী, ফ্যাসিলিটিতে আমাদের অফিস শুরু তো দশটায়, তাই না?’

‘হ্যাঁ। এখানকার সব অফিসই দশটা-পাঁচটা। চলুন, বাড়িতেই ফিরি। আরেকবার কফি খেয়ে এক সঙ্গে ল্যাবে যাওয়া যাবে।’

উপকূল থেকে ফিরবার পথে রয়েছে ওরা, চেইন-লিঙ্ক ফেন্সের

গেটটা সামনে দেখা যাচ্ছে, এই সময় কর্নেল জারকার ওয়াকি-টকি পিপ্-পিপ্ করে উঠল। রেডিও অপারেটর মেসেজ পাঠাচ্ছে। মন দিয়ে শুনল সে। চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ ফুটছে। সেট অফ করে দিয়ে হাত তুলে পাহাড় চূড়াটা কর্নেল বেনুনকে দেখাল।

'এখানকার একজন সিকিউরিটি অফিসার, মেজর রাব্বি উলমা, আজ সকালে ওদিকের জঙ্গল হয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠেছিল। রানার ক্যাম্পটা পেয়েছে সে। পরিত্যক্ত। আপনার ধারণা সত্যি হতে পারে। এখানকার পরিস্থিতি দেখেই হয়তো লেজ তুলে পালিয়েছে।'

সে থামতে না থামতে আবার পিপ্-পিপ্। মেসেজটা শুনবার সময় ভুরু জোড়া কুঁচকে রাখল।

'কী ধরনের ঝামেলা?...ঠিক আছে, তাকে শান্ত হতে বলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল মেজর বেনুন।

'ফাদার ইয়াহুদ, গির্জা থেকে। কী কারণে যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। চলুন, দেখা যাক।' জিপ ঘুরিয়ে নিল জারকা।

গির্জার খোলা দরজার সামনে, ধাপগুলোর মাথায়, পায়চারি করছেন তিনি। ফাদার ইয়াহুদকে দেখলে যে-কারও ফোলানো বেলুনের কথা মনে পড়ে যাবে, এমনই মোটা আর বেঁটে।

'জলদি আসুন, কর্নেল,' বলেই স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়লেন তিনি গির্জার ভিতর।

জিপ থেকে নেমে তাঁর পিছু নিল দুই কর্নেল।

আইল ধরে হন-হন করে এগোচ্ছেন ফাদার, বেদীকে পাশ কাটিয়ে ভেসট্রিতে ঢুকে পড়লেন। কামরাটা ছোট, ফার্নির্চার বলতে কাঠের একটা আলমারি। ওটার ভিতর ফাদারের সমস্ত কাপড়-চোপড় রাখা হয়। নাটকীয় একটা ভঙ্গিতে আলমারির পাল্লা দুটো মেলে ধরলেন তিনি। বললেন, 'দেখুন!'

তাকাল তারা। ফাদার ইয়াহুদ দুর্ভাগা শ্রমিকটাকে যেভাবে পেয়েছেন, এখনও ঠিক সেভাবেই পড়ে আছে সে। তাকে মুক্ত করবার কোনও চেষ্টা করা হয়নি। তার কবজি দুটো পিঠমোড়া করে টেপ দিয়ে বাঁধা হয়েছে; পায়ের গুল্ফ দুটোও তাই। চওড়া এক প্রস্থ টেপ ঢেকে রেখেছে মুখটা। বন্ধ মুখের ভিতর থেকে প্রতিবাদসূচক গোঙানির আওয়াজ বেরুচ্ছে। কর্নেল জারকাকে দেখে তার চোখে নগ্ন আতংক ফুটে উঠল।

সামনের দিকে ঝুঁকল জারকা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে লোকটার মুখ থেকে খুলে নিল টেপটা। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল বেচারা। 'এটা এখানে কি করছে?'

আতঙ্কিত লোকটা হড়বড় করে কী সব বলছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কান পেতে শুনে প্রিস্ট বললেন, 'লোকটা বলছে সে কিছু জানে না। কাল রাতে নিজের খুপরিতে ঘুমিয়েছিল, ঘুম ভেঙেছে এখানে। মাথাটা ব্যথা করছে। আর কিছু মনে করতে পারছে না।'

শর্টস ছাড়া লোকটার পরনে আর কিছু নেই। টেনে দাঁড় করাবার জন্য বাধ্য হয়ে তার হাত ধরতে হলো জারকাকে। 'কিছু মনে নেই বললে কি শুনব? কী ঘটেছে তাড়াতাড়ি স্মরণ করো।'

এখানে আসবার পর এই প্রথম কথা বলল কর্নেল বেনুন। 'আগের কাজ আগে, কর্নেল। প্রথমে ওর নাম জানুন।'

ফাদার ইয়াহুদ বললেন, 'ওর নাম মাইকেল।'

'মাইকেল? আর কী?'

আবার কাঁধ ঝাঁকালেন ফাদার। ক্যাম্পে প্রায় পঞ্চাশজন খ্রিস্টান শ্রমিক আছে, তাঁর পক্ষে কি সবার পুরো নাম মনে রাখা সম্ভব?

'কোন্ খুপরির লোক ও?' জানতে চাইল জারকা।

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে এবার মাইকেল নিজেই

জবাব দিল। একশো ছয় নম্বর খুপরি, এখান থেকে তিনশো মিটার দূরে।'

'চলো, দেখাও আমাদের,' বলল কর্নেল বেনুন, একটা পেননাইফ বের করে মাইকেলের কবজি আর পায়ের টেপ কেটে দিল।

নার্ভাস এবং কাতর লোকটা ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গলিটায় ঢুকে হাত তুলে নিজের দরজাটা দেখাল সে।

বেনুনকে পিছনে নিয়ে খুপরির ভিতর ঢুকল জারকা। খুঁজে পাওয়ার মত কিছুই নেই, শুধু বিছানার নীচে গুঁজে রাখা তুলোর একটা ছোট প্যাড ছাড়া। প্যাডটা তুলে শুঁকল জারকা, তারপর বেনুনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। বেনুনও শুঁকল।

'ক্লোরোফর্ম,' বলল জারকা। 'ঘুমের মধ্যে জ্ঞান হারায় মাইকেল। সম্ভবত কিছুই টের পায়নি। ঘুম ভেঙেছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাবার্ডের ভেতর। লোকটা মিথ্যে কথা বলছে না। তবে ভয় পেয়েছে।'

'আপনি না ডগ ট্যাগের কথা বলছিলেন আমাকে, শ্রমিকদের সবার কাছে একটা করে থাকে? গেট পেরুবার সময় গার্ডদের দেখাতে হয়?'

'হ্যাঁ। তাতে কী?'

'মাইকেলের গলায় ওটা নেই। নেই এই খুপরির মেঝেতেও। আমার ধারণা, চেইন-লিঙ্ক ফেন্সের ভেতর, নিষিদ্ধ এলাকায় কেউ একজন ঢুকে পড়েছে, কর্নেল জারকা। কেউ একজন বলতে আমরা বোধহয় মাসুদ রানাকে ধরে নিতে পারি।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পুরোপুরি বোধগম্য হলো জারকার। দীর্ঘ পদক্ষেপে ল্যান্ড রোভারের কাছে ফিরে এসে ড্যাশবোর্ড থেকে ওয়াকি-টকি নামাল।

'কর্নেল জারকা বলছি। ইমার্জেন্সি,' বলল সে। 'কয়েদি পালিয়ে গেলে সাইরেন যে আওয়াজ করে, সেটা বাজাও। নেভির

রিসার্চ ল্যাব-এর গেট সিল করে দাও। সিকিউরিটি অফিসারদের বলো, ফ্যাসিলিটির প্রত্যেক গার্ড, ডিউটি থাকুক বা না থাকুক, মেইন গেটে এসে যেন আমার কাছে রিপোর্ট করে।'

ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে পাঁচজন এক্সপার্ট। সবাই তারা মেজর, আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ও মোসাদের এজেন্ট। কাজেই তাদের উপর কর্নেল জারকার হুকুম চালাতে কোন অসুবিধা নেই।

কয়েক সেকেন্ড পরেই গোটা পেনিনসুলায় সাইরেন বেজে উঠল। খেত–খামার, পাহাড়ের ঢাল, স্টাফ কোয়ার্টার, ক্যাম্প, হ্যাঙ্গার, এমনকী টহলরত পেট্রল বোট থেকেও তা শোনা গেল।

সাইরেন বাজিয়ে আসলে গার্ড আর সিকিউরিটি অফিসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হলো। আওয়াজটা থামতেই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাহায্যে গোটা ফ্যাসিলিটিতে ছড়িয়ে দেয়া হলো একটা ঘোষণা: 'সমস্ত গার্ডের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ডিউটি থাকুক বা না থাকুক, দশ মিনিটের মধ্যে মেইন গেটে জড়ো হও সবাই। আবার বলছি, দশ মিনিটের মধ্যে সব গার্ডকে মেইন গেটে জড়ো হতে হবে।'

মোটরসাইকেল, জিপ, মোপেড আর সাইকেল নিয়ে ছুটল গার্ডরা। চল্লিশজন ডিউটি দিচ্ছিল, তার ত্রিশজনই পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল মেইন গেটে। বাকিদের পৌঁছাতে দশ মিনিট লেগে গেল। এদের সঙ্গে যোগ দিল অফ-ডিউটির আরও দশজন গার্ড।

ইতিমধ্যে মেইন গেটে অফিসারদের ভিড় লেগে গেছে। মেজর ল্যাঙ্কিকে কর্নেল জারকার পিছনে দেখা যাচ্ছে। কন্ট্রোল রুম থেকে চলে এসেছে পাঁচ সিকিউরিটি এক্সপার্টদের তিনজন।

ল্যান্ড রোভারের বনেটের উপর দাঁড়িয়েছে কর্নেল জারকা। হাতে একটা বুলহর্ন।

'কেউ পালায়নি,' গার্ডদের সবাই তার সামনে জড়ো হতে

বলল সে। 'উল্টোটা ঘটেছে। কেউ একজন ঢুকে পড়েছে ভেতরে। একজন শ্রমিকের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে সে। একই ইউনিফর্ম, একই শ্যু। তার কাছে একটা ডগ ট্যাগও আছে। এবার বলছি কী করতে হবে।

'ডে শিফটের গার্ডরা সমস্ত শ্রমিককে খেদিয়ে এনে জড়ো করো। একজনও যেন বাদ না পড়ে। অফ-ডিউটির গার্ডরা প্রতিটি গোলাঘর, আস্তাবল, খোঁয়াড়, ওঅর্কশপ, ওয়্যারহাউস, টুলশেড, কসাইখানা, স্টোর—মোটকথা সবকিছু সার্চ করো। যখনই কোথাও সার্চ শেষ হবে, জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে সিল করে দেবে।

'স্কোয়াড কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে ওয়াকি-টকির মাধ্যমে। জুনিয়র লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। যাও, সবাই কাজ শুরু করো। শ্রমিকের ইউনিফর্ম পরা কাউকে যদি ছুটে পালাতে দেখো, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। যাও!'

পঞ্চাশজন গার্ড গোটা ফ্যাসিলিটির ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। জায়গাটা এত বড় যে পুরোটা সার্চ করতে পঞ্চাশজন লোকেরও কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে।

'মেজর ল্যাঙ্কি,' বনেট থেকে নীচে নেমে বলল জারকা, 'তুমি আমাদের ল্যাবে চলে যাও। ওটার পাঁচিলের গেট সিল করে দেয়া হয়েছে...'

'কর্নেল জারকা,' তাকে বাধা দিল কর্নেল বেনুন।

'এক মিনিট ,' বলে আবার মেজর ল্যাঙ্কির দিকে মনোযোগ দিল জারকা।

ঘাড় ফিরিয়ে গির্জার গেটের দিকে তাকাল কর্নেল বেনুন। ওখানে আরবী ভাষায় একটা নোটিশ টাঙানো হয়েছে। তাতে লেখা: 'আমাদের একজন ভাই ডেভিড তারিককে সমাধিস্থ করা হবে। সকাল দশটায়।'

বেনুন ভাবছে, মাসুদ রানা কি নোটিশটা দেখেনি? রবিবার

ছাড়া অন্যান্য দিন প্রিস্ট তার ভেসট্রিতে সাধারণত আসে না, কিন্তু আজকের দিনটা তো আলাদা। আজ সকাল ন'টা থেকে দশটার মধ্যে ভেসট্রির আলমারিটা সে খুলবেই, এটা বুঝতে না পারবার তো কোন কারণ ছিল না তার।

মাইকেলকে রানা অন্য কোথাও লুকায়নি কেন? খুপরিতেই মুখে টেপ লাগিয়ে বেঁধে রাখা হয়নি কেন? তা হলে তো সেই সন্ধে পর্যন্ত কেউ তাকে খুঁজে পেত না।

'হ্যাঁ, এবার বলুন,' মেজর ল্যাঙ্কিকে ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়ে বেনুনের দিকে ফিরল জারকা।

ধাঁধাটা বলল বেনুন।

জারকা জবাব দিল, 'ব্যাটা ভুল করেছে। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। এই ভুলের জন্যে চড়া মূল্য দিতে হবে তাকে। হ্যালো, এমআরনাইন!' দাঁতে দাঁত পিষে রাখলেও হাসছে সে। 'এবার তুমি পালাবে কীভাবে?'

ওয়াকি-টকিতে গর্জে উঠল কর্নেল জারকা। 'কী বললে?'

'জী, স্যার, ঠিকই বলছি,' বলল মেজর ল্যাঙ্কি। 'এখানে এসে দেখি কয়েকজন গার্ড বাইরে থেকে আমাদের ল্যাব বিল্ডিং ঘিরে রেখেছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল তারা। আমাকে দেখে বলল, তাদের কাছে চাবি নেই, গেটহাউসে কোন গার্ডকেও দেখা যাচ্ছে না।'

'গেটহাউসে গার্ড নেই মানে? এ তো অসম্ভব কথা! এই জায়গা ছেড়ে নড়লে চাকরি তো যাবেই, তার সমস্ত পাওনাও মারা যাবে।'

'জী, সার, জানি,' বলল ল্যাঙ্কি। 'কিন্তু গার্ডহাউস খালি। আমি চাবি আনবার জন্যে কন্ট্রোল রুমে একজনকে পাঠিয়েছি...'

'ঠিক আছে। ভেতরে ঢুকে দেখো গার্ড ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। তারপর রিপোর্ট করো আমাকে।' ওয়াকি-টকি অফ করল

জারকা।

আরও পনের মিনিট পার হলো। চোখে বিনোকিউলার না থাকলেও নীল ইউনিফর্ম পরা শ্রমিকদের প্রথম সারিটাকে দেখতে পেল কর্নেল বেনুন। পাশেই খাকি ইউনিফর্ম পরা গার্ডরা চিৎকার করে লাইন সোজা রাখতে বলছে।

ইস্পাতের প্রকান্ড গেটের সামনে লোকজনের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। ওয়াকি-টকিতে সারাক্ষণ কথা বলছে গার্ড আর অফিসাররা। একের পর এক অনেক দালানে তল্লাশির কাজ শেষ হলো। শেষ হওয়া মাত্র সিল করে দেওয়া হচেছ। ইতিমধ্যে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাহায্যে নিষিদ্ধ এলাকার অফিসার আর বিজ্ঞানীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত কেউ যেন তাদের নিজেদের কোয়ার্টার ছেড়ে বের না হয়।

চল্লিশ মিনিট পর আবার পিপ্-পিপ্। অপরপ্রান্তে মেজর ল্যাঙ্কি। হাঁপাচ্ছে। 'সার! কর্নেল জারকা! সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'তুই শালা দেখছি আমার হার্টের সর্বনাশ করে ছাড়বি!' জারকার ঠোঁট নড়লেও, আওয়াজ বেরুল না। বেরুল একটু পরে, 'আগে শান্ত হও। তারপর বলো কী হয়েছে। চাবি কোথায়? ল্যাব বিল্ডিঙে ঢুকে গার্ডকে দেখেছ?'

'গার্ড নেই, সার!' কথার ফাকে বিষম খাওয়ার মত আওয়াজ করল ল্যাঙ্কি। 'মানে সে বেঁচে নেই, সার! এখানে তার লাশ পড়ে আছে!'

'হোয়াট!'

'সার! কর্নেল! আমাদের ল্যাবও নেই!'

জারকা হঠাৎ বোবা হয়ে গেল। তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, ওরে বুড়বাক, গার্ডের মত ল্যাবটাও কি মারা গেছে? কিন্তু তার মুখ থেকে কোন শব্দই বেরুচ্ছে না।

'আমাদের রিসার্চের সবগুলো সাবজেক্টকে খুন করা হয়েছে,

সার!' প্রলাপ বকবার মত একঘেয়ে সুরে বলে যাচ্ছে মেজর ল্যাঙ্কি। 'প্রতিটি কামরার সবগুলো কমপিউটারের হার্ডডিস্ক বের করে ভেঙে ফেলা হয়েছে...'

'তারমানে ফর্মুলাটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল...সর্বনাশ বলছ কেন? এ তো কেয়ামত!' ভাষা ফিরে পেয়ে হাহাকার করে উঠল কর্নেল জারকা। সে খুব ভাল করেই জানে, দায়িত্ব পালনে এরকম চরম ব্যর্থতার জন্য তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হতে পারে।

হয়তো রানাকে, দায়ী ব্যক্তিকে, অ্যারেস্ট করতে পারবার উপর নির্ভর করবে তার জীবন-মৃত্যু। 'ভাল করে সার্চ করে দেখো, ভেতরে রানা লুকিয়ে নেই তো?'

'সে কি বোকা যে এখানে লুকিয়ে থাকবে...'

'কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে ভাল করে দেখে লিখিত রিপোর্ট করো আমাকে,' ল্যাঙ্কিকে নির্দেশ দিল সে। 'লক্ষ রাখো কেউ যেন কিছু না ছোঁয়। এদিকের কাজ শেষ করেই আসছি আমি।'

'ইয়েস, সার।'

পাঁচটা লাইনে দাঁড়িয়েছে আড়াইশো শ্রমিক। প্রত্যেকের ট্যাগ চেক করে দেখা হচ্ছে, যতক্ষণ না আজ সকালে কমপিউটারে রেকর্ড করা সংখ্যার সঙ্গে মিলছে সেটা। পাঁচটা টেবিলে গার্ড আর অফিসাররা অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে।

রিসার্চ ল্যাব ধ্বংস হয়ে গেছে, বিশেষ করে কমপিউটারগুলো একটাও অক্ষত নেই, এ খবর শুনে রীতিমত অসুস্থ বোধ করছিল কর্নেল জারকা। সেটা বুঝতে পেরে বেনুন তাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিল। ব্যাপারটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত লাগল জারকার। তবে উত্তরে কিছু বলল না সে।

সময় নষ্ট না করে প্রজেক্টের চিফ সায়েনটিস্ট জেনেটিক

ইঞ্জিনিয়ার আইজ্যাক ইলতুত-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল জারকা। আর সব বিজ্ঞানীর মত সে-ও ফ্যাসিলিটির ভিতর অফিসার্স কোয়ার্টারে থাকে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে জারকা তাকে বলল, 'ধরুন ল্যাবের প্রতিটি কমপিউটার হার্ডডিস্ক ভেঙে ফেলা হয়েছে। আপনাদের গবেষণার রেজাল্ট, ফর্মুলা সহ, চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল বলে ধরে নিতে হবে?'

'না,' আইজ্যাক ইলতুত জবাব দিল। 'তবে হার্ডডিস্ক নষ্ট করে ফেলার মত বুদ্ধি যার আছে, সে কি ফ্লপি বা সিডিগুলো অক্ষত রেখে গেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'ধরুন সিডি, ফ্লপি কিছুই নেই–তা হলে?'

'পনের থেকে পঁচিশ বছর পিছিয়ে যাব আমরা,' জবাব দিল ইলতুত। 'ওই ফর্মুলায় জটিল অনেক কিছু ছিল, যা আমাদের কারও পক্ষে মুখস্থ করা সম্ভব হয়নি। আর কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক নিষেধ থাকায় ফর্মুলাটা আমরা একাধিক জায়গায় রাখতে পারিনি...'

যোগাযোগ কেটে দিল জারকা। আবার ল্যাঙ্কির সঙ্গে কথা বলতে হবে তাকে। তবে জবাবটা সে এখনই আন্দাজ করতে পারছে–সবই ভেঙে ফেলেছে রানা।

অবশেষে নীল ইউনিফর্ম পরা শ্রমিকদের সবাই গেট পার হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল। 'একজন নিখোঁজ,' সবচেয়ে সিনিয়র চেকার গলা চড়িয়ে জানাল।

এগিয়ে এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে মনিটরের দিকে তাকাল জারকা।

'নম্বরটা হলো,' বলল সিনিয়র চেকার, 'একশো একুশ।'

'নাম?'

'মাইকেল কাফুর।'

বন করে সিকিউরিটি এক্সপার্টদের মুখোমুখি হলো কর্নেল

জারকা। 'কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিন।'

তিনজনেই তারা নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল।

বেনুনের পাশে ফিরে এল জারকা। 'কুকুরগুলো স্পেশাল। এমনভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, কালো, নীল আর খাকি ইউনিফর্ম পরা লোকজনকে ধরবে না।'

'কিন্তু রানা তো কাফুরের ইউনিফর্ম পরেই আছে!' প্রতিবাদের সুরে বিস্ময় প্রকাশ করল বেনুন।

'সে কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম!' জারকার চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব। দরদর করে ঘামছে সে। 'কুকুরগুলোকে এখন বিশেষ নির্দেশ দিয়ে ছাড়া হবে, বলা হবে–নীল ইউনিফর্ম দেখলে ধরো। এখন তো আমরা জানি ফ্যাসিলিটির ভিতর মাত্র একটা লোকই ইউনিফর্ম পরে আছে।'

'হুঁ।'

'ডোবারম্যানদের জন্যে এটাকে লাঞ্চ বেল বলা যেতে পারে। গাছে উঠবে রানা? পুকুরে নামবে? ওই ইউনিফর্মের গন্ধ শুঁকে সেখানে পৌঁছে যাবে ওগুলো। তারপর ঘিরে রাখবে, যতক্ষণ হ্যান্ডলাররা না পৌঁছায়। রানাকে আমি আধ ঘন্টা সময় দিচ্ছি, এই সময়ের মধ্যে একটা গাছে উঠে সারেন্ডার করুক, আর নয়তো মারা যাক–দুটোর একটা বেছে নিতেই হবে তাকে।'

যার কথা বলছে জারকা, সেই মাসুদ রানা এই মুহূর্তে ফ্যাসিলিটির মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে, ওর মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে থাকা ভুট্টা খেতের ভিতর দিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে দৌড়াচ্ছে।

চোদ্দ

ইস্পাতের গেট দিয়ে ফ্যাসিলিটির ভিতর ঢুকবার পর টুল- শেড থেকে মোয়ার নিয়ে চোদ্দো ফুটী পাঁচিলটার দিকে রওনা হলো রানা। মেশিনটা ছোট, দেড় ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া, সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে নিতে কোনও অসুবিধে হলো না।

মেইন গেট থেকে অনেক দূরে চোদ্দো ফুটী পাঁচিলটা, তাই ওদিকে যাদের ডিউটি পড়েছে তাদেরকে পৌঁছে দিল একটা জিপ। ভাগ্যক্রমে ওর ডিউটি পড়েছে নিষিদ্ধ এলাকার ভিতর–নেভির ল্যাব থেকে তিন দালান পর।

রওনা হলেও, পাঁচিলটা খানিক দূরে থাকতে মোয়ার মেশিন সহ সাইকেল নিয়ে নেমে পড়ল রানা। প্রথমে নিশ্চিত হলো, ওকে কেউ বিশেষভাবে লক্ষ করছে না। তারপর দিক বদলে ঝরনার স্রোতকে বেঁধে রাখা পাকা নালার দিকে সাইকেল ছুটাল। পাহাড়ের চূড়া থেকে আগেই দেখে রেখেছে, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে একটা কালভার্ট আছে ওদিকে। এই কালভার্টের উপর দিয়েই রিসার্চ ল্যাবের গার্ডরা আসা-যাওয়া করে।

কালভার্ট পার হয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকল রানা, মোয়ার আর সাইকেল লুকিয়ে রেখে ক্রল করে এগোল চেইন-লিঙ্ক ফেন্স লক্ষ্য করে।

লাঞ্চ ব্যাগে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একজোড়া ওয়্যার কাটারও রয়েছে, ভিতরে ঢুকবার মত বেড়া কাটতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না ওর।

কালভার্টের কাছে ঝোপের ভিতর ফিরে এসে ওত পেতে থাকল রানা। দশ মিনিটও পেরোয়নি, ঝোপের ফাঁক দিয়ে খাকি ইউনিফর্ম পরা গার্ডকে কালভার্টের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল।

পাহাড়ের মাথা থেকে চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে দেখা, ফলে চিনতে কোন অসুবিধা হলো না–এই লোক নেভির রিসার্চ ল্যাবের

গেটে যাচ্ছে, নাইট গার্ডের কাছ থেকে ডিউটি বুঝে নেওয়ার জন্য।

রানাকে পাশ কাটাল লোকটা। উল্টো করে ধরা পিস্তলের বাঁট সবেগে তার খুলির পিছনে পড়ল। ব্যথাটা এক-দুই সেকেন্ডের জন্য টের পেল সে, তারপরই জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল রানার বাড়ানো হাতের ভিতর।

টেনে তাকে ঝোপের আড়ালে নিয়ে এল রানা। প্রথমেই দেখে নিল খুলি থেকে রক্ত বেরুচ্ছে কিনা। বেরুলে সমস্যা। না, বেরুচ্ছে না।

লোকটার পায়ের জুতো সহ পরনের ইউনিফর্ম খুলে ফেলল রানা। সেগুলো গুছিয়ে লুকিয়ে রাখল কাছাকাছি একটা ঝোপের ভিতর। ট্রাউজারের পকেট থেকে শুধু চাবির গোছাটা বের করে নিয়েছে ও।

অজ্ঞান গার্ডের হাত-পা বাঁধল রানা, মুখে টেপ লাগাল, তারপর সাবধানের মার নেই ভেবে একটা ইঞ্জেকশন দিল—অন্তত ঘন্টা তিনেক ঘুম ভাঙবে না তার।

লাঞ্চ ব্যাগ থেকে আরও কয়েকটা জিনিস বের করল ও। তার মধ্যে একটা হলো শ্রমিক মাইকেল কাফুরের আরেক প্রস্থ ইউনিফর্ম।

এখানকার বাকি কাজ শেষ করে ঝোপ থেকে মোয়ার সহ সাইকেলটা নিয়ে ফিরতি পথ ধরল রানা, নিষিদ্ধ এলাকার ঘাস কাটতে যাচ্ছে। ওর লাঞ্চ ব্যাগটা এখন খুবই হালকা।

নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকবার জন্য পাঁচিলের গেটে বেশ কিছু শ্রমিক লাইন দিয়েছে, তাদের পিছনে এসে সাইকেল থেকে নামল রানা। গেট খুলে রেখেছে গার্ডরা, ট্যাগ পরীক্ষা করে একজন একজন করে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে শ্রমিকদের।

এক সময় রানার পালা এল। চেহারা, চোখের রঙ, গায়ের রঙ ইত্যাদি দেখে না গার্ডরা, শুধু ট্যাগ আর স্লিপ দেখে। রানার

ওঅর্ক স্লিপে আরবী আর হিব্রু ভাষায় লেখা আছে—লনের ঘাস কাটবার দায়িত্ব দেওয়া গেল। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে হাত নেড়ে গেটের ভিতর ঢুকবার অনুমতি দিল গার্ড।

মনের উল্লাস চেপে, চোখে-মুখে একজন শ্রমিকের বিষণ্ন ভাব ধরে রেখে হাঁটছে রানা। কয়েক মিনিট পরই ইংরেজি "এল" আকৃতির সাদা চুনকাম করা দালানটা দৃষ্টিসীমায় চলে এল। নিজেকে রানা মনে করিয়ে দিল, খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে। স্টাফ আর বিজ্ঞানীরা ল্যাবে পৌঁছায় দশটায়। খুব বেশি হলে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ভিতরে থাকতে পারবে ও। ল্যাব থেকে বেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার জন্য হাতে কিছু বেশি সময় থাকা দরকার।

আগে ভিতরে ঢোকো তো, ঢুকে জরুরী কাজগুলো সারো, তারপর না হয় পালাবার কথা ভাবা যাবে। নিজেকে মৃদু তিরস্কার করল রানা।

এবার পেরুতে হবে ছয় ফুটী পাঁচিল। এটাই শেষ। পাঁচিলের গায়ে লোহার গ্রিল লাগানো গেটটা বন্ধ। গার্ডহাউস থেকে বেরিয়ে এসে ওটার সামনে পায়চারি করছে গার্ড। পালাবদলের সময় উতরে গেছে, এখনও দ্বিতীয় গার্ডের দেখা নেই, অস্থিরতা বোধ করবার সেটাই বোধহয় কারণ।

গায়ে-মাথায় গরম চাদর জড়ানো, তা সত্ত্বেও শীতে কাঁপছে শ্রমিক। মোয়ার মেশিন ক্যারিয়ারে বাঁধা, সাইকেলটা চালিয়ে আনল সে। পায়চারি থামিয়ে একদৃষ্টে তাকে লক্ষ করছে গার্ড।

গেটের সামনে থেমে শ্রমিক, অর্থাৎ রানা পকেট থেকে ট্যাগ আর স্লিপটা বের করে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

'কী?' কম কথার লোক গার্ড, আরবীতে সংক্ষেপে জানতে চাইল।

'ঘাস কাটব,' বলল রানা, আরবীতেই।

'আর সময় পাওনি? পালাবদলের সময় টেনশনে আছি। যাও,

এখন বিরক্ত কোরো না।’

‘কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে সাহেবরা দশটায় অফিসে আসার আগেই লনের সব ঘাস কেটে ফেলতে হবে।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ঘাড় ফিরিয়ে দালান পর্যন্ত পাকা পথের দু’পাশে চোখ বুলাল গার্ড। হঠাৎ তার ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল। ঝট করে রানার দিকে তাকাল সে। ‘এই, ঘাস তো সব কাটাই দেখছি। দু’একদিনের মধ্যে কাটা হয়েছে। তুমি তা হলে...’

‘আরে বাবা, দু’দিন আগে আমিই কেটে গেছি,’ তাড়াতাড়ি বলল রানা, বানিয়ে জবাব দিচ্ছে। ‘শুধু সামনের দিকটা কাটা হয়েছে, আজ পিছনের দিকটা কাটব।’

এগিয়ে এসে রানার বাড়ানো হাত থেকে ট্যাগ আর স্লিপটা নিয়ে পরীক্ষা করল গার্ড। তারপর ওগুলো ফিরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল গার্ডহাউসে। ওখান থেকে বোতাম টিপে বিদ্যুচ্চালিত গেটটা খুলল সে। চাদরের ভিতর হাত ভরে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখল রানা।

শান্ত ভঙ্গিতে ভিতরে ঢুকল রানা, শব্দ শুনে বুঝল পিছনে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গেট। সাইকেলটা গেটের ভিতর একপাশে রেখে, মোয়ার মেশিনটা একহাতে চালিয়ে দালানের পিছনদিকে নিয়ে যাচ্ছে ও, অপর হাতটা চাদরের ভিতর।

গার্ডহাউস থেকে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিল গার্ড। নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছে সে, তা না হলে দ্বিতীয় গার্ডের অপেক্ষায় গেটের কাছে না থেকে দালানের পিছন দিকে কেন আসছে?

লোকটা নিজের চোখে দেখতে চায় পিছনের ঘাস সত্যি কাটা হয়েছে কিনা।

দালানের কোণে পৌঁছাল রানা, বাঁকটা নেওয়ার ঠিক এক সেকেন্ড আগে ঘুরল ও, মুখোমুখি হলো গার্ডের।

ওকে ঘুরতে দেখে ঝট করে কোমরে ঝুলানো হোলস্টারের

দিকে হাত বাড়াল গার্ড। একটানে মেশিন পিস্তলটা বের করে আনছে, এই সময় চাদরের ভিতর ওয়ালথারের ট্রিগার টেনে দিল রানা। পর পর দু'বার। সাইলেন্সার লাগানো আছে, ফলে ঢপ্-ঢপ্ করে মৃদু আওয়াজ হলো−বিশ গজ দূর থেকেও কেউ শুনতে পাবে না।

পাশাপাশি বাম বুকে ঢুকে হৃৎপিণ্ডে জায়গা করে নিয়েছে বুলেট দুটো, গার্ডের শিথিল আঙুল থেকে ঘাসের উপর খসে পড়ল মেশিন পিস্তল। সেটার পিছু নিয়ে লাশটাও।

টেনে সেটাকে দালানের পিছনে নিয়ে এল রানা। কিছু ঘাস কেটে লাশের উপর ছড়িয়ে দিল ও। হাতে সময় কম, তাই লাশটা ভালভাবে লুকানো গেল না।

দালানটার পিছন থেকে সামনে চলে এল রানা। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। মোয়ার মেশিনটা দরজার পাশে রেখে এসেছে।

সামনে একটা লম্বা করিডর। বাঁক নেওয়ার পর দেখল এটা আরও বেশি লম্বা। শেষ মাথায় একটা লোহার দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজা না বলে গেট বললেই যেন বেশি মানায়।

সেটার সামনে দাঁড়াল রানা, পরীক্ষা করে দেখছে গোছার কোন্ চাবিটা তালায় ঢোকে। হাত দুটো হঠাৎ একবার স্থির হয়ে গেল ওর। বিচিত্র একটা শব্দ ঢুকল কানে। যেন পানির আওয়াজ। কলকল করছে।

গেট খুলে গেল। ভিতরটা বড়সড় হ্যাঙ্গারের মত। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। মাঝখানে একটা সুইমিং পুল দেখা যাচ্ছে, অদৃশ্য কোন মেশিনের সাহায্যে একের পর এক ঢেউ তোলা হচ্ছে তাতে। সুইমিং পুলের ডান দিকে এক সারিতে কাঁচের তৈরি বিশাল দশটা পানি ভর্তি ভ্যাট রয়েছে−একেকটা কম করেও দশ ফুট উঁচু, ডায়ামিটারে সাত ফুটের কম নয়। ভ্যাটগুলোয়, একটা বাদে সবগুলোয়, কিছু আছে। কী যেন নড়ছে

ওগুলোর ভিতর।

প্রথম ভ্যাটের কাছে পৌঁছে স্থির হয়ে গেল রানা। পানি ভর্তি ভ্যাটের ভিতর জ্যান্ত একজন মানুষ বসে আছে। লোকটার সঙ্গে অক্সিজেন বটল নেই।

ভ্যাটের আরও সামনে এসে দাঁড়াল রানা। স্বচ্ছ, পরিষ্কার কাঁচের ভিতর লোকটাকে চিনতে পারল ও। এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কাকতালীয়ই বলতে হবে। এই লোকের নাম ইগর কোমানভ। সাবেক রুশ ইন্টেলিজেন্স কেজিবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পাই ছিল সে। ছিল রানার প্রাণের দুশমন।

হ্যাঁ, ছিল। আনআর্মড কমব্যাটে রানার হাতেই মৃত্যু হয় তার। সে আজ থেকে সাত-আট বছর আগের কথা।

আশ্চর্য! তা হলে ইগর কোমানভকেও নতুন করে জন্ম দেওয়া হয়েছে? উভচর মানুষ হিসাবে?

যেন রানার বিস্ময় স্পর্শ করেছে কোমানভকে। চোখ মেলল সে। কয়েক মুহূর্ত কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। তার কুন্ডলী পাকানো শরীরটা লম্বা হলো। ভ্যাটের ভিতর সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, কোমানভ ওকে চিনতে পারছে। ধীরে ধীরে দু'কোমরে হাত রাখল সে। চোখ গরম করছে। দাঁতে দাঁত পিষছে।

ওখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে এল রানা। পাশের ভ্যাটের মানুষটাও ওর চেনা। এ একসময়ে সিআইএ-র দুর্ধর্ষ এজেন্ট ছিল। নাম নেল মার্টিন। কয়েকবারই রানাকে খুন করবার অ্যাসাইনমেন্ট পায় সে, বলাই বাহুল্য, সফল হতে পারেনি। রানার মনে আছে, ওকে খুন করবার জন্য মার্টিন একবার হাত মিলিয়েছিল পাকিস্তানি এজেন্ট মেজর আরিফের সঙ্গে।

আরিফ ছিল আরেক ব্যর্থ স্পাই, রানাকে খুন করবার কয়েকটা মিশন সফল হয়নি তারও। দু'জন তাই ওর বিরুদ্ধে

জোট বাঁধে।

সেবার ওরা রানাকে ধরবার জন্য প্যারিসে ফাঁদ পেতেছিল। পুরানো এক দাগী আসামী, ইনফরমারও বটে, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রানাকে সাবধান করে দেয়। ফলে সেই ফাঁদে ওদের দু'জনকেই ফেলে দেয় রানা। পালাতে গিয়ে তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে একটা পা ভেঙে ফেলে মার্টিন। মেজর আরিফের ভাগ্য অতটা ভাল ছিল না।

আরিফের একটা শারীরিক দুর্বলতা ছিল। তার খুলির একটা অংশে কখনোই হাড় গাজায়নি, শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকত। মারা যায় ওই দুর্বল জায়গাতে রানা একটা লম্বা সুই ঢুকিয়ে দেওয়ায়।

মার্টিন জেগেই আছে। কয়েকটা মাছের সঙ্গে খেলছে। সে-ও অক্সিজেন ছাড়া দিব্যি বেঁচে রয়েছে পানির ভিতর। রানার উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। প্রায় মিনিট খানেক তাকিয়ে থাকবার পর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল সে।

তৃতীয় ভ্যাটের লোকটাও এসপিওনাজ এজেন্ট। একেও রানা চেনে। অনিমেষ দস্তিদার ভারতীয়। দু' মাস আগের খবর জানে রানা, সে বেঁচে আছে, অফিশিয়াল দায়িত্ব পালন করছে মুম্বাইয়ে।

রানার বন্ধু অনিমেষ। ওকে দেখে চিনতে পেরে হাসল। পানির ভিতর তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বোঝা গেল বলছে: 'হাই, দোস্ত!'

চার আর পাঁচ নম্বর ভ্যাটে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বেলফোর আর মায়ানমারের থোন ফালান। দু'জনেই রানার শত্রু।

ছয় আর সাতে জর্দানের তোবারক আর মিশরের আশরাফুল। এদেরকে চেনে রানা, পরিচয় নেই। আটে সিরিয়ার মামুন–বন্ধু। নয়ে সম্ভবত মালয়েশিয়ার রাহমান, ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

দশ নম্বর ভ্যাটটা খালি দেখল রানা।

‘ওটা আমার ছিল।’

ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। ছোট্ট একটা ক্যাবিনের দরজা পুরোপুরি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল প্রকান্ডদেহী মেজর আরিফ। চওড়া গোঁফে চাড়া দিচ্ছে সে, ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্য মেশানো ব্যাঙ্গাত্মক হাসি।

‘কী অদ্ভুত, তাই না, রানা?’ বলল আরিফ। ‘এক জীবনে তোমাকে মারতে পারিনি। আরেক জীবনে সুযোগ এসে গেল। তুমি অস্বীকার করতে পারো এতে আল্লার হাত নেই?’

‘আল্লার হাত কীসে নেই? এই যে তুমি ইহুদিদের দাস হয়ে জন্মেছ, এতেও তো আল্লার হাত আছে।’ ঘাড় চুলকাল রানা। আসলে দেখে নিল নীল ইউনিফর্মের ভিতর, ওর নিজের শার্টের কলারে, ইস্পাতের কাঠিটা যেমন রেখেছে তেমনি আছে কিনা। দেশলাইয়ের কাঠির চেয়ে একটু বেশি লম্বা, তবে আরও সরু। এটা অনেক কাজেই লাগে, তবে জাদু দেখায় তালা খুলতে।

কথা না বাড়িয়ে দু’হাত তুলে বক্সারের মত পজিশন নিয়ে একই জায়গায় লাফাতে শুরু করল আরিফ।

মানসিক প্রস্তুতি নিল রানাও। কিন্তু লাফানোর ফাঁকে গলায় ঝুলানো ইস্পাতের চাকতির এক জায়গায় ওকে চাপ দিতে দেখে বুঝল, কপালে খারাবি আছে আজ। শক্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিল ওর চিরশত্রু।

দু’মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল কী ঘটতে যাচ্ছে। আরিফের রিফ্লেক্স এত ভাল যে রানা তার সামনে দাঁড়াতেই পারছে না। ও কখন আঘাত করবে, কীভাবে, এ-সব নিয়ে আরিফের যেন কোন মাথাব্যথাই নেই–যখন যেভাবে আঘাত আসুক, প্রায় অনায়াসে সেটাকে ঠেকিয়ে দিচ্ছে সে।

এই মার ঠেকানোটা আরিফের দ্বিতীয় কাজ। প্রথম কাজ হলো একনাগাড়ে রানার চোয়াল, চিবুক, মাথা, চোখের কিনারা আর নাকে ঘুসি মারা। মাঝে মাঝে পেটেও মারছে যাতে দম

ফুরিয়ে যায় রানার।

তিন মিনিটের মাথায় রক্তাক্ত রানা পড়ে গেল পাকা মেঝেতে। ইতিমধ্যে ওর দুটো দাঁত নড়ে গেছে। ভেঙে গেছে নাকটা। একদিকের চোয়ালের হাড় একটু হলেও সরে গেছে।

আরিফ ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে আবার। চোখ মেলে ওর পা দুটো দেখতে পাচ্ছে রানা। মনে হচ্ছে হাতির পা। ওই পায়ের একটা লাথি খেলে আর উঠতে হবে না, ভাবল রানা।

অনেক কষ্টে সিধে হচ্ছে ও, যেন ওর পিঠে কেউ তিন মণী বস্তা চাপিয়ে দিয়েছে। টলমল করছে পা। ভাল করে দাঁড়ানোর সময় পাওয়া গেল না। আবার শুরু করল আরিফ। লাথিই চালাল সে।

সেটা রানা এড়াবার কোন চেষ্টা করল না, কারণ জানে তা সম্ভব না। বগলের নীচে আরিফের পা ঢুকতে দিল ও। তারপর চাপ দিয়ে আটকে ফেলল।

এক পায়ে দাঁড়িয়ে নাচছে আরিফ। রানার ডান হাত আরেকবার উঠল ইউনিফর্মের নীচে পরে থাকা শার্টের কলারে। দু'আঙুলের চাপে ইস্পাতের কাঠিটা বের করে আনল ও।

আরিফকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার ভান করল রানা, তার বদলে তাকে নিজের দিকে টেনে নিল ও। খুলিটা নাগালের মধ্যে আসতেই হাতের কাঠিটা তার চাঁদির ডান পাশে সবেগে গেঁথে দিল। ঘর কাঁপানো চিৎকার ছাড়ল আরিফের ডাবল।

ছেড়ে দিতেই দড়াম করে আছাড় খেল পাকা মেঝেতে। গলা কাটা মুরগির মত লাফাচ্ছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর স্থির হয়ে গেল সে।

পনের

সুইমিং পুল, কাঁচের তৈরি দশটা ভ্যাট আর ক্যাবিনটাকে পিছনে ফেলে এল রক্তাক্ত রানা। সামনে রেইলিং দিয়ে ঘেরা সিঁড়ির মাথা দেখা যাচ্ছে।

ধাপ বেয়ে সাবধানে নেমে এল। নীচে এটা বেসমেন্ট, তারমানে সুইমিং পুলটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে। একটা চওড়া করিডরে নেমে এসেছে ও। দু'পাশের চারটে দরজাই বন্ধ, তবে জানালাগুলো খোলা। ফলে ভিতরে কী আছে দেখবার সুযোগ হলো।

ল্যাবরেটরি। বকযন্ত্র, কাঁচের জার, রাসায়নিক পদার্থে ভর্তি ক্যান আর বোতল, টিউব আর পাইপ, এক্সরে মেশিন, আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন, ব্রেন স্ক্যানার, অপারেশন টেবিল, কমপিউটার ইত্যাদি আরও কত কী যে রয়েছে বলে শেষ করা যাবে না।

তালা খুলে এক এক করে সবগুলো ল্যাবেই ঢুকল রানা। 'ক্লোন অ্যান্ড মেকানিকাল সাবজেক্ট' বানাবার ফর্মুলা কোন্ কমপিউটারের হার্ডডিস্কে রয়েছে জানা নেই, কাজেই প্রত্যেকটিই নষ্ট করতে হবে। ফ্লপি আর সিডি যা আছে তাও। টুলবক্স থেকে লম্বা হাতলওয়ালা একটা হাতুড়ি নিল রানা। তারপর প্রতিটি সিপিইউ-র কেসিং খুলল। হার্ডডিস্ক ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তার ছিঁড়ে বের করে আনল। মেঝেতে ফেলে হাতুড়ির কয়েকটা বাড়ি মারতেই দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে গেল ওগুলো। এসব হার্ডডিস্ক কারও আর কোন কাজে আসবে না।

কমপিউটার টেবিলের দেরাজ খুলে ফ্লপি আর সিডি যা পেল সবই ধ্বংস করল রানা।

ল্যাবগুলোয় ভাঙচুর চালিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠে এল রানা। কাঁচের ভ্যাটগুলোকে পাশ কাটানোর সময় নীচের দিকে হাতুড়ির একটা করে বাড়ি মারতে ভুলল না।

শ্বাসযন্ত্রে কিংবা হয়তো ফুসফুসে খুঁত থাকায় পানি ছাড়া এরা বাঁচে না। রানাকে অন্তত তাই বলা হয়েছে। বাস্তবেও তাই দেখা গেল।

কাঁচের গায়ে বাড়ি পড়তেই চমকে উঠল কোমানভ। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর, ভ্যাটের পানি দ্রুত কমে যাচ্ছে দেখে, আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কাঁচ ভেঙে যাওয়ায় যে ফাঁকটা তৈরি হয়েছে, নিজের শরীর দিয়ে সেটাকে বন্ধ করবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল সে। যখন দেখল তা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তলার অবশিষ্ট পানিতে নাক গুঁজে দিল। কিন্তু ফাঁকটা দিয়ে তলার সবটুকু পানি বেরিয়ে গেল। নাক-মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকতেই নিজের গলাটা দু'হাতে চেপে ধরল কোমানভ। অক্সিজেনের অভাবে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে সে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, নীল হয়ে যাচ্ছে চেহারা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নেতিয়ে পড়ল সে। এগিয়ে গিয়ে তার পালস্ দেখল রানা। নেই।

দ্বিতীয় ভ্যাটে রয়েছে মার্টিন। রানা কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হাতজোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে কৃত্রিম মানুষ। রানার কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। মার্টিনের ভ্যাট ভেঙে সামনে এগোল ও।

তৃতীয় ভ্যাট অনিমেষ দস্তিদারের। করুণ, বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রিয় বন্ধু। হাতুড়ি তুলল নির্মম রানা। 'দুঃখিত, দোস্ত—এ তোর ভালর জন্যেই!'

নয়টা ভ্যাট ভেঙে দালানটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। মোয়ার মেশিনটা নিয়ে গার্ডহাউসে ঢুকে বোতাম টিপে গেট খুলল। তারপর গেট বন্ধ করবার জন্য 'ওয়ান মিনিট ডিলে' বাটনে চাপ

দিয়ে একলাফে বেরিয়ে এল গেটহাউস থেকে, একহাতে সাইকেল ধরে ছুটে গেট পেরুল।

ঘটাং করে শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল গেট। সেদিকে না তাকিয়ে মোয়ার মেশিনটা ক্যারিয়ারে বেঁধে নিয়ে সাইকেলে প্যাডেল মারল রানা, চোদ্দ ফুট পাঁচিলে বসানো বড় গেটটার দিকে ছুটছে।

গার্ডহাউস থেকে বেরিয়ে এসে একজন গার্ড লক্ষ করছে ওকে। কাছাকাছি আসতে রানা দেখল লোকটার ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'কী ব্যাপার? ফিরে যাচ্ছ যে?'

রানার চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। ইঙ্গিতে মোয়ার মেশিনটা দেখাল গার্ডকে। 'ব্যাটারি কাজ করছে না। যাই, টুল শেড থেকে বদলে আনি।'

গার্ডের পেশিতে ঢিল পড়ল। গেটহাউসে ঢুকে বোতাম টিপল সে। গেট খুলে গেল। সাইকেল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা।

খানিক দূর প্যাডেল মেরে এসে দিক বদলে রওনা হলো কালভার্টের দিকে।

কিলার ডগ তাকে ছোঁবে না, এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ল্যান্ড রোভারের সবগুলো কাঁচ তুলে দিয়েছে কর্নেল জারকা। মেইন গেট পার হয়ে ফ্যাসিলিটির মাঝখানে পৌঁছাতে চাইছে সে, গাড়ি চালাচ্ছে ধীর গতিতে।

তার পিছনের ট্রাকে রয়েছে ডেপুটি ডগ-হ্যান্ডলার। লোকটা বসে আছে ইস্পাতের তৈরি তারের একটা জালের ভিতর। সিনিয়র হ্যান্ডলার বসেছে ল্যান্ড রোভারে, জারকার পাশের সিটে। সেই প্রথম খেয়াল করল কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ করবার আওয়াজ পাল্টে গেছে। এতক্ষণ ভরাট গলায় থেমে থেমে ডাকছিল, এখন উত্তেজিত হয়ে ঘন-ঘন হাঁক ছাড়ছে।

'কিছু একটা পেয়েছে ওরা,' সিনিয়র হ্যান্ডলার উত্তেজনায়

চেঁচিয়ে উঠল।

ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল জারকার। 'কোথায়, মিস্টার, কোথায়?' হিসহিস করে উঠল সে।

'ওইদিকে।'

কর্নেল বেনুন গাড়ির পিছনের সিটে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে, ভাবছে ল্যান্ড রোভারের দেয়াল আর জানালাগুলো যথেষ্ট মজবুত কিনা। হিংস্র কুকুরকে যমের মত ভয় পায় সে। বারোটা ডোবারম্যানকে বার হাজার বলে মনে হচ্ছে তার।

কুকুরগুলো কিছু যে পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে তাদের চিৎকার যতটা না উত্তেজনাবশত তারচেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণাপ্রসূত।

একটা কালভার্টের পাশে ভিড় করেছে ডোবারম্যানের পুরো দল। ভুট্টা খেতের উপর দিয়ে ওগুলোর পিছনে এসে ল্যান্ড রোভার থামাল জারকা। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রক্ত মাখা নীল একটা ইউনিফর্ম তাদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে।

'ওগুলোকে ট্রাকে তোলো,' গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল জারকা।

সিনিয়র হ্যান্ডলার গাড়ি থেকে নেমে গেল। দরজা বন্ধ করে শিস দিয়ে শান্ত হতে বলল কুকুরগুলোকে। বিনা প্রতিবাদে, যদিও অনবরত চেঁচাচ্ছে, সরে এসে ট্রাকের পিছনে উঠে পড়ল গোটা দল। দরজা বন্ধ করে তাতে তালা লাগাল সিনিয়র হ্যান্ডলার। এতক্ষণে কর্নেল জারকা আর কর্নেল বেনুন ল্যান্ড রোভার থেকে নামল।

'আচ্ছা, এখানেই তা হলে বেজন্মাটাকে পাওয়া গেছে!' বলল জারকা, চোখে-মুখে হিংস্র উল্লাস।

সিনিয়র হ্যান্ডলার, ডোবারম্যানগুলোর আচরণে এখনও হতভম্ব, রক্তমাখা নীল শার্টটা শুঁকবার জন্য নাকের কাছে তুলল। পরমুহূর্তে ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে নিল মুখটা।

'শালার মাথায় বাজ পড়ুক!' দাঁতে দাঁত পিষল লোকটা। 'মরিচের গুঁড়ো! মিহি করা শুকনো মরিচ! এত বেশি ছড়ানো হয়েছে যে কাপড়টা মোটা লাগছে। ওগুলো তো চেঁচাবেই! কীসের উত্তেজনা, প্রচণ্ড জ্বালায় চেঁচাচ্ছে।'

দাঁত জারকাও পিষছে। 'ওগুলোর নাক কখন আবার কাজ শুরু করবে?' জানতে চাইল সে।

'আজ না, বস্; হয়তো কালও না।'

নীল প্যান্টটাও পাওয়া গেল, তাতেও অঢেল মরিচের গুঁড়ো ছড়ানো হয়েছে, এমনকী ক্যানভাসের জুতো জোড়াতেও। কিন্তু কোন লাশ নেই, নেই হাড়গোড়ও। শার্টে শুধু রক্ত আছে।

'এখানে ঠিক কী করেছে রানা?' হ্যান্ডলারকে জিজ্ঞেস করল জারকা।

'বোধহয় নিজেকে কেটেছে, বস। নিজেকে ছুরি দিয়ে কেটে শার্টটায় রক্ত মাখিয়েছে। ব্যাটা জানত এই রক্ত কুকুরগুলোকে পাগল করে তুলবে। কিল পেট্রলে থাকার সময় মানুষের রক্ত ওগুলোকে তাই করে। রক্ত পেলে শুঁকবেই—পা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভাল করে শুঁকেছেও, সেই সঙ্গে শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস ভরে নিয়েছে মরিচের গুঁড়ো। অন্তত চব্বিশ ঘন্টা ট্র্যাকার ডগের সার্ভিস বন্ধ থাকবে।'

নীল ইউনিফর্মের সবগুলো আইটেম গুনল জারকা। 'দেখা যাচ্ছে সব কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়েছে সে। আমরা তা হলে বিবস্ত্র এক লোককে খুঁজছি?'

'তা বোধহয় নয়,' বলল কর্নেল বেনুন।

'ও, মনে পড়ছে—মাইকেল কাফুরের দুই সেট ইউনিফর্ম খোয়া গেছে...' বেনুনকে মাথা নাড়তে দেখে চুপ হয়ে গেল জারকা। তারপর বলল, 'তা হলে ইউনিফর্মের নীচে রানা নিজের কাপড় পরে আছে?'

কথা না বলে হাসল বেনুন। কাছাকাছি কাঁটাঝোপের গায়ে

গার্ড ইউনিফর্মের একটা ব্যাজ আটকে থাকতে দেখেছে সে। ধরে নেওয়া চলে এখানে ধস্তাধস্তি হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে গার্ডের শার্ট থেকে ছিঁড়ে কাঁটাঝোপে আটকে গেছে ওটা।

'আমার ধারণা, আপনার লোক বিবস্ত্র নয়,' বলল বেনুন। 'সে একটা ক্যামোফ্লাজ শার্ট পরে আছে, তবে তাতে ব্যাজ নেই। একজন গার্ডের খাকি ট্রাউজার আর কমব্যাট বুটও পরে আছে সে। আর মাথায় আছে বুশ হ্যাট।'

জারকার মুখটা দেখতে হলো কাঁচা লালচে মাটি। তবে প্রমাণ নিজেই নিজের গল্প ব্যাখ্যা করছে। ঘাসের উপর এক জোড়া গোড়ালি টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। দাগগুলো শেষ হয়েছে কিনারা বাঁধানো নালার ধারে।

'তারমানে একজন গার্ডকে খুন করে ঝরনার পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে–খাদ্য বানানো হয়েছে পিরানহার। তারপর তার ড্রেস পরে...ড্রেস পরে কোন দিকে গেছে সে? কোন্ দিকে যেতে পারে?'

'আপনার বা আমার বাংলোটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়,' মৃদুকণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিল বেনুন। 'ভেবে দেখুন না–শাকিলাকে সরিয়ে দেয়ার পর, ক্লোনগুলোকে মেরে ফেলার পর, রিসার্চ ল্যাব ধ্বংস করে দেয়ার পর তার আর কোন্ কাজটা বাকি থাকল?'

'কোন্‌টা?'

'আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করাটা,' বলল বেনুন। 'কাজেই সে আপনার বাংলোর ওদিকেই গেছে। একজন গার্ডই শুধু বিনা চ্যালেঞ্জে ওখানে ঢুকতে পারবে।'

ওয়াকি-টকি অন করল জারকা। 'আমার বাংলোর চারপাশে অতিরিক্ত আরও পাঁচজন গার্ড চাই আমি। তাদের ড্রেস হবে এয়ারফিল্ড টেকনিশিয়ানদের মত কালো। গার্ডের ড্রেস পরা কোন লোককে তারা যেন বাংলোর ভেতর ঢুকতে না দেয়। আশপাশে

কাউকে দেখা গেলে অ্যারেস্ট করতে হবে। নতুন এই গার্ডদের সঙ্গে সবরকম অস্ত্র থাকবে।'

ল্যান্ড রোভার ঘুরিয়ে নিজের বাংলোর দিকে ফিরছে জারকা। বেলা এখন দুটো।

কালভার্টের কাছাকাছি ঝোপের ভিতর ফিরে এসে রক্তাক্ত নীল ইউনিফর্ম খুলে ফেলল রানা, নিজের কাপড়চোপড়ের উপর দ্রুত পরে নিল অজ্ঞান গার্ডের ইউনিফর্ম। সময় বাঁচানোর জন্য লোকটার গা থেকে ওগুলো আগেই খুলে রেখে গিয়েছিল ও।

মেজর আরিফের মার খেয়ে শরীরের বেশ কয়েক জায়গা থেকে যথেষ্ট রক্ত বেরিয়েছে, ফলে এখনও আধ ভেজা হয়ে আছে শ্রমিকের ইউনিফর্ম। ক্যানভাস শ্যু সহ ওই ইউনিফর্মে প্রচুর পরিমাণে শুকনো মরিচের গুঁড়া ছড়াল রানা।

গার্ডের মেশিন পিস্তলটা নিয়েছে ও। ইউনিফর্মের পাউচ আর পকেটে ভরে নিয়েছে লাঞ্চ ব্যাগের কয়েকটা জিনিস: তারমধ্যে টাইমার আর ডিটোনেটর সহ খানিকটা বিস্ফোরকও আছে। কিছু জিনিস লাঞ্চ ব্যাগেও ভরেছে।

শেষ একটা কাজ বাকি ছিল, সেটাও কৌশলে সম্পন্ন করল রানা। কিছু ঘাস ছিঁড়ল, আর কাঁটা ঝোপের কিছু ডাল ভাঙল–কেউ দেখলে যাতে বুঝতে পারে এখানে ধস্তাধস্তি হয়েছে। তারপর কাঁধ থেকে কাপড়ের ব্যাজ ছিঁড়ে আটকে দিল কাঁটাঝোপের একটা কাঁটায়।

ও যে গার্ডের ইউনিফর্ম পরে আছে, শত্রুদের এটা জানানো দরকার।

গার্ড লোকটা কীভাবে মারা গেছে বলা মুশকিল। হতে পারে মাথায় আঘাতটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জোরে হয়ে গিয়েছিল। কিংবা হয়তো 'শক'-এ মারা গেছে। ঘুমের জন্য দেওয়া ইঞ্জেকশন তার জন্য ওভারডোজ হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র কিছু না।

লোকটাকে ঝরনার পানিতে ফেলতেই হত রানার, কারণ শত্রুপক্ষকে বুঝতে দিতে হবে ইউনিফর্ম চুরি করবার জন্য একজন গার্ডকে মেরে লাশটা লুকিয়ে ফেলেছে ও। জ্যান্ত নয়, ঝরনার স্রোতে তার বদলে মরা মানুষ ফেলতে হওয়ায় খানিকটা স্বস্তি বোধ করল ও।

ঝাঁক বেঁধে ছুটে এল খুনি পিরানহা। প্রবল আলোড়ন উঠল পানিতে। স্রোতের সঙ্গে দ্রুত দূরে সরে গেল উথলানো ভাবটা।

লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে এয়ারফিল্ডকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা চেইন-লিঙ্ক ফেন্সের সামনে চলে এল রানা।

আজ সকালে বেড়া কেটে রেখে গেছে ও। ক্রল করে ঢুকে পড়ল ভিতরে, তারপর সাইকেলটাকে টেনে নিল।

এখান থেকে হ্যাঙ্গার পর্যন্ত ভুট্টা খেত আর লম্বা ঘাস। দ্রুত সাইকেল চালিয়ে হ্যাঙ্গারের দিকে রওনা হলো রানা। লাঞ্চ ব্যাগটা ঘাসের ভিতর ফেলে রেখে যাচেছ।

একশো গজও পেরোয়নি, শুনতে পেল কুকুরগুলো অসম্ভব ঘেউ-ঘেউ করছে। আপন মনে হাসল রানা। রক্তাক্ত নীল ইউনিফর্মটা খুঁজে পেয়েছে ওগুলো।

হ্যাঙ্গার থেকে সাতশো গজ দূরে রয়েছে রানা। ঝরনার মূল স্রোত যেখানে রানওয়ের তলায় ঢুকেছে, তার পাশে লম্বা ঘাসের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। মাইল দুয়েক প্যাডেল মেরে এখানে পৌঁছেই ঝরনার পানিতে ফেলে দিয়েছে সাইকেলটা।

রাত ঠিক আটটায় হ্যাঙ্গারে পালা বদল ঘটতে দেখেছে রানা। কাছাকাছি কোয়ার্টার থেকে এয়ারফিল্ড গার্ডরা আসে, আসে হকার ১০০০-এর পাইলট আর কো-পাইলট, হেলিকপ্টারের পাইলট, মেইন্টেন্যান্স ক্রু আর কন্ট্রোল টাওয়ার অপারেটররা। এখানে গার্ড থেকে শুরু করে সবারই ইউনিফর্ম কালো।

ফ্যাসিলিটির ভিআইপি-রা কেউ কোথাও যাক বা না যাক,

এয়ারফিল্ডের সবাইকেই পালা করে কাজে আসতে হয়। হঠাৎ কখন কী ইমর্জেন্সি দেখা দেয় কে জানে, তাই সারক্ষণ প্রস্তুত থাকাই এখানকার নিয়ম।

ঝোপের ভিতর থেকে হ্যাঙ্গারের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। হেলিকপ্টারটা সার্ভিসিং করবার পর হ্যাঙ্গার থেকে বের করে একপাশে রাখা হয়েছে। কিন্তু পরে আর হকার ১০০০-কে হ্যাঙ্গারের ভিতর টো করে ঢোকানো হয়নি।

এই প্লেন বা কপ্টার খুব বেশি ব্যবহার করা হয় না। শত্রুপক্ষের একটা ত্রুটি দেখতে পেয়ে আপনমনে একটু হাসল রানা। কুকুরের উপর বেশি আস্থা ছিল সিকিউরিটি এক্সপার্টদের। উচিত ছিল আকাশ থেকে তল্লাশি চালানো। তা চালালে এই জায়গায় পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন হত ওর জন্য।

গোটা ফ্যাসিলিটিতে সশস্ত্র গার্ডরা ছড়িয়ে পড়েছে। গার্ডের ইউনিফর্ম পরা বিদেশী স্পাই মাসুদ রানার খোঁজে খেত-খামার থেকে শুরু করে সিকিউরিটি অফিসার আর নামকরা বিজ্ঞানীদের বাসভবনেও চলছে চিরনি অভিযান।

কর্নেল জারকার সঙ্গে তার বাংলোর টেরেসে বসে রয়েছে কর্নেল বেনুন। দরজায় তৈরি ল্যান্ড রোভার। কোথাও থেকে একটা খবর আসতে যা দেরি, অমনি গাড়ি নিয়ে ছুটবে ওরা।

তবে সময় থেমে নেই। সময় যত গড়ায়, আশঙ্কার দিকটা ততই বড় হয়ে দেখা দিতে থাকে। এক সময় সন্দেহ প্রকট হয়ে উঠল। যেভাবেই হোক, গার্ডদের চোখ ফাঁকি দিয়ে গোধূলি পর্যন্ত লুকিয়ে রয়েছে রানা।

সন্ধ্যার আগে কি তা হলে ধরা পড়বে না?

সন্ধ্যার সময় প্রশ্নটা দাঁড়াল—সে কি রাতটাও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে? নাকি এরই মধ্যে ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে?

কী যেন ভাবছিল কর্নেল জারকা, হঠাৎ রাত আটটার দিকে চমকে উঠল সে।

'কী হলো?' তাকে রীতিমত ঝাঁকি খেতে দেখে বিস্মিত হয়েছে বেনুন।

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল জারকা। তারপর কর্কশ গলায় বলল, 'আপনি...হ্যাঁ, আপনিই আমাকে ডাইভার্ট করেছেন!'

'হোয়াট?' বেনুন কেবল বিস্মিত নয়, বিরক্তও।

'আপনার ধারণাটাই ভুল ছিল। আমি কে? আমার কী গুরুত্ব? রানা আমাকে কি কারণে মারতে আসবে? তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, তাই বুঝতে পারিনি আপনি অবাস্তব কথা বলছেন। এটা ফ্যাসিলিটির পিছন দিক, এদিকে তার তো আসার কোন কারণই নেই...'

'তা হলে কী করবে সে? কোনদিকে যাবে?' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল বেনুন।

'রানা এয়ারফিল্ডের দিকে যাবে!' প্রবল উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জারকা। 'সে পালাবার পথ খুঁজবে!' ওয়াকি-টকি অন করে কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে সে। 'টাওয়ার? কর্নেল জারকা। সন্দেহ করছি প্লেন বা কপ্টার, যে-কোন একটা হাইজ্যাক করা হতে পারে। যতক্ষণ না আমি পৌঁছাচ্ছি ওগুলোকে ঘিরে রাখতে হবে।' যোগাযোগ কেটে দিল সে। 'আসুন!' টেরেস থেকে ধাপ বেয়ে নেমে গেটের দিকে ছুটছে। তার পিছু নিল কর্নেল বেনুন।

সন্ধ্যা সাতটায় এয়ারফিল্ডের চারদিক অন্ধকার হয়ে উঠল। তবে হ্যাঙ্গারের সামনে লোকজন খুব বেশি না থাকলেও, আলোর কোন অভাব নেই। গার্ডের ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরে ওদিকে এখন যাওয়া আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। আগেই দেখেছে

রানা, এয়ারফিল্ডের সবাই কালো ইউনিফর্ম পরে ডিউটি দিতে আসে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এয়ারফিল্ডের আরেকদিকে রওনা হলো রানা, সাগরের কাছাকাছি যেদিকটায় পাঁচ-সাতটা ছোট ভিলা রয়েছে। এয়ার ক্রু আর মেইনটেন্যান্স স্টাফ থাকে ওগুলোয়। কপ্টার আর প্লেনের পাইলটরা কোন্ ভিলায় থাকে, আগে থেকে দেখে রেখেছে ও।

দু'নম্বর ভিলাটায় প্লেনের পাইলট থাকে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে এসেছে রানা, কর্কশ আওয়াজ তুলে গেটটা খুলে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিতে একটা ছায়ামূর্তিকে বেরুতে দেখা গেল। এয়ারফিল্ডের দিকে রওনা হলো সে। সম্ভবত হকারের দ্বিতীয় পাইলটই হবে। ধরে নিতে হয় প্রথমজন হ্যাঙ্গারের ভিতর নিজেদের অফিসে আছে।

চার নম্বর ভিলার গেটের পাশে ওত পেতে থাকল রানা। এই বাড়িটায় কপ্টারের দুই পাইলটকেই কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে দেখেছে ও। তাদের মধ্যে একজন এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই হ্যাঙ্গারের ভিতর আছে। আরেকজন এখনই ভিলা থেকে বেরিয়ে তার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিতে যাবে।

লোকটা সাতটা পঁচিশ মিনিটে গেট থেকে বেরুল। অন্ধকার ঝোপের আড়াল থেকে সুযোগ-সন্ধানী বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। বেশি না, জায়গা মত মাত্র দুটো ঘুসি মেরে প্রথমে তাকে অজ্ঞান করল, তারপর টেনে আনল ঝোপের ভিতর।

তবে খুলে নেওয়ার আগে কালো ইউনিফর্ম সার্চ করে হতাশই হলো রানা। লোকটার কাছে কপ্টারের চাবি নেই।

তার হাত দুটো পিছমোড়া করে টেপ দিয়ে বাঁধল রানা। বাঁধল এক করা দুই গোড়ালিও। তারপর টেপ লাগাল মুখে।

গার্ডের ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম খুলে কপ্টার পাইলটের ড্রেসটা পরল রানা। আঁটসাঁট হলেও, চলে।

পরিত্যক্ত ইউনিফর্ম আর অজ্ঞান পাইলটকে ঝোপের ভিতর রেখে হন-হন করে হাঁটা ধরল রানা। এয়ারফিল্ডে ফিরছে।

ফিরবার পথে দু'জন লোক পাশ কাটাল ওকে। দু'বারই আড়াল নিল রানা, ধারণা করল লোকগুলো প্লেনের পাইলট আর কো-পাইলট হতে পারে।

গাঢ় ছায়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এলেও, এক সময় হ্যাঙ্গারের মাথায় বসানো পাঁচশো পাওয়ারের বালবের আলোয় বেরুতেই হলো রানাকে। তবে হ্যাঙ্গারের বাইরেটা আগের মতই প্রায় ফাঁকা দেখল ও। আলোটা উজ্জ্বল বলেই নীচ থেকে দেখা গেল হকারের ককপিটে লোক নেই। তবে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করে প্রথমবার ব্যর্থ হলো রানা। ককপিটে ঢুকবার দরজা লক করা। চেষ্টা করলে তালাটা খোলা হয়ত যাবে, তবে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তাতে ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। কাঠের মোবাইল সিঁড়িটা ঠেলে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজায় নিয়ে এল রানা। এদিকের দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকে জরুরি কাজটা সারতে পাঁচ মিনিট লাগল ওর।

ঘড়িতে এই মুহূর্তে ঠিক আটটা পাঁচ। কর্নেল জারকা এই মাত্র দেড় শো গজ দূরের কন্ট্রোল টাওয়ারের নাইট অফিসারের সঙ্গে কথা বলা শেষ করেছে। হকার থেকে নেমে এসে কপ্টারের দিকে হাঁটছে রানা। নেহাতই ভাগ্য বলতে হবে, ফাইবারগ্লাসের বুদ্বুদে তালা দেওয়া নেই। কন্ট্রোলের সামনে বসল রানা। হেডসেটটা পরল মাথায়। সুইচ, ডায়াল, বাটন, লিভার, গজ—কোনটার কী কাজ সব ওর মুখস্থ।

কপ্টার স্টার্ট দেওয়ার ঠিক আগে একটা কথা ভেবে বিস্ময় বোধ করছে রানা—সত্যি তা হলে বেরিয়ে যেতে পারছে ও? পরমুহূর্তে মনে পড়ে গেল এটা সম্ভব হচ্ছে যতটা না ওর দক্ষতায়, তারচেয়ে অনেকবেশি ইজরায়েলিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গলদ থাকায়।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কালো ড্রেস পরা একদল গার্ড মেশিন পিস্তল উঁচিয়ে হ্যাঙ্গারের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

ওদের লিডারকে চিনতে পারল রানা, কপ্টারের দিকে চোখ রেখে ওয়াকি-টকিতে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। যন্ত্রটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে কপ্টারের দিকে একটা হাত লম্বা করল সে, নির্দেশ দিল,'ফায়ার!'

কয়েকটা মেশিন পিস্তল একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। কপ্টারের ধাতব গায়ে বৃষ্টির মত বুলেট লাগছে। ফাইবারগ্লাস বুদ্বুদ মাকড়াসার জাল হয়ে গেল। মাথাটা রানা নিচু করে নিয়েছিল, তা না হলে অন্তত একটা বুলেট হেডসেটে লাগত। দিক বদলে দু' সেকেন্ড এদিক ওদিক ছুটোছুটি করল সেটা, কন্ট্রোল প্যানেলের খানিকটা গুঁড়িয়ে দিয়ে তারপর স্থির হলো।

ফুট দুয়েক শূন্যে উঠেছিল কপ্টার, ঝপ করে খসে পড়ল নীচে। ঝাঁকি খেল রানা। হেলমেট পরা মাথা জানালার সঙ্গে ঠুকে গেছে।

ভাঙা লিভার কোন রকমে ধরে অপারেট করছে রানা। ওদিকে উল্লাসে ফেটে পড়ছে সশস্ত্র গার্ডরা। মেশিন পিস্তলে নতুন ক্লিপ ভরছে আরেক দফা হামলা চালাবার জন্য।

ইতিমধ্যে রানার হাতেও একটা মেশিন পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। কপ্টার সাড়া দিচ্ছে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে শূন্যে উঠছে আবার, এই সময় ব্যারেল দিয়ে আঘাত করে মাকড়াসার জাল হয়ে থাকা উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে ফেলল ও। ফাঁক দিয়ে অস্ত্রটা বের করে গুলি করল এক পশলা।

এই সময় রানওয়ের দূরপ্রান্তে এক জোড়া হেডলাইট দেখা গেল। একটা গাড়ি ঝড়ের বেগে ছুটে আসেছে এদিকে।

পাল্টা গুলি জাদুর মত কাজ করল। আড়াল পাওয়ার জন্য যে যেদিকে পারে ছুটল গার্ডরা।

কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে এল রানা। শিকার পালাচ্ছে বুঝতে পেরে আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার একনাগাড়ে গুলি করছে গার্ডরা। বুলেটগুলো লাগছে না, তা নয়, তবে কপ্টারের তলা বা পাশ ফুটো করতে পারল না।

তারপর রেঞ্জের বাইরে উঠে এল কপ্টার। দিক বদলে শহরের দিকে রওনা হলো রানা।

তবে এখনও পিছু ছাড়েনি বিপদ। হ্যাঙ্গারের আলোয় পরিচিত ল্যান্ড রোভারটাকে এখন রানা চিনতে পারছে। কর্নেল জারকাকে নীচে নামতে দেখল। সঙ্গে আরও একজন দীর্ঘদেহী লোক। হকারের পাইলটকেও চিনতে পারল রানা, হাতে হেডসেট। তিনজনই ওরা ছুটল প্লেনটার দিকে।

ওকে ধাওয়া করবার সিদ্ধান্তটা নিশ্চয় কর্নেল জারকার।

পিছন দিকে রানা তাকায়নি, তবে বিস্ফোরণের আওয়াজটা বেশ জোরেই শুনতে পেল। ডিটোনেটর আর টাইমার এমন কৌশলে ফিট করেছিল ও, ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বিস্ফোরিত হয়। তাই হয়েছে।

বুদ্বুদের খোলা দরজা দিয়ে রশির মইটা নীচে ফেলে দিল রানা। আরেকবার দেখে নিল কপ্টারের নাক বরাবর সামনে কোন বাধা নেই। মসজিদটার উপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে কোর্স লক করল। তারপর মইয়ে পা দিয়ে বেরিয়ে এল বুদ্বুদ থেকে। কালো ইউনিফর্ম খুলে ফেলেছে। ওর পরনে এখন নিজের পোশাক।

মসজিদটার পিছনের উঠানে এত রাতে কারও থাকবার কথা নয়। মইয়ের শেষ মাথা থেকে ঝুপ করে ঘাসের উপর পড়ল রানা। মই সহ কপ্টার অলস গতিতে নিজের পথে ছুটে চলেছে–খানিক পরই সাগরের উপর পৌঁছে যাবে। তারপর যেদিক খুশি যায় যাক না।

মসজিদ থেকে মেক্সিকান দূতাবাস দু'মিনিটের হাঁটা পথ। মেইন রোডে রানা বেরুলই না, অলি-গলি ধরে দূতাবাসের পিছনের দরজায় পৌঁছে গেল। মেক্সিকানদের নিজস্ব গার্ড আছে, আচরণ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল ওর জন্য অপেক্ষা করছিল তারা।

সসম্মানে পথ দেখাল গার্ড। কয়েকটা বারান্দা আর করিডর পার হয়ে একটা সিটিংরুমে এনে বসানো হলো ওকে। ওর বন্ধু রিকার্ডো বারকুচি একটু পরই স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হলো। দু'জনের মাথাতেই মেক্সিকান হ্যাট দেখা যাচ্ছে। সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

দ্রুত এগিয়ে এসে বন্ধুকে বুকে টেনে নিল রিকার্ডো। 'তোর অপেক্ষায় দু'দিন ধরে বসে আছি আমরা,' বলল সে, পিঠ চাপড়ে দিল রানার। 'কী পার হয়ে এসেছিস আন্দাজ করতে পারি–তবে আসতে যে পেরেছিস, এতেই আমরা খুশি।'

'শাকিলা কোথায়?' বন্ধু একটু ঢিল দিতে জানতে চাইল রানা। 'ঠিকমত পৌঁছেছে তো?'

'হ্যাঁ,' বলে স্ত্রীকে পথ ছেড়ে দিল রিকার্ডো।

রানার সামনে চলে এসে মিটিমিটি হাসছে কনসুয়েলা বারকুচি, একটু যেন পোজ দেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে সে।

রানা সামান্য হলেও অপ্রস্তুত। বিব্রত ভাবটা কাটাবার জন্য রিকার্ডোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু শাকিলাকে দেখছি না কেন? তাকে ডাক।'

'তা হলে স্বীকার করছিস তোকে বোকা বানানো গেছে?' সহাস্যে জানতে চাইল রিকার্ডো, মেক্সিকান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি।

'মানে?' ঝট করে কনসুয়েলার দিকে তাকাল রানা। 'উনি...ও...নো, দ্যাটস ইমপসিবল!'

'এই ইমপসিবল তোর বেলায়ও সম্ভব হতে যাচ্ছে। আমাদের মেকআপ এক্সপার্টের সামনে এক ঘণ্টা বসবি খালি, তারপর

আয়নায় তাকিয়ে দেখবি তোকে সে বারকুচি বানিয়ে ফেলেছে। ঠিক শাকিলা মেহরুনকে যেমন কনসুয়েলা বানিয়েছে।' হাত তুলে বাথরুমের দরজাটা দেখাল রানাকে। 'জলদি শাওয়ার সেরে নে। নতুন এক সেট ড্রেস জোগাড় করে রেখেছি। তারপর ডাক্তারকে বিশটা মিনিট সময় দিবি।' হাতঘড়ি দেখল। 'তোদের জন্যে আঙ্কারাগামী প্রতিটি ফ্লাইটের টিকিট বুক করা রয়েছে–তোদের মানে, মেজর রিকার্ডো আর কনসুয়েলা বারকুচির। পরবর্তী ফ্লাইট বারোটায়–আর মাত্র দু'ঘন্টা পর। চারটে খেয়ে নিয়েই দৌড় দিতে হবে তোদের।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, দোস্ত...'

'সেটা ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে যাবার পর দিবি, এখন কী?' বলে প্রায় ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে রানাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল রিকার্ডো বারকুচি।

***